একক ১ ☐ জনসংখ্যা শিক্ষার ধারণা (Concept of Population Education)

গঠন (Structure)

১.১ সূচনা

১.২ উদ্দেশ্য

১.৩ জনসংখ্যা শিক্ষার ধারণা

- ১.৩.১ জনসংখ্যা শিক্ষার সংজ্ঞা
- ১.৩.২ জীবনযাত্রার মান

১.৪ জনসংখ্যা শিক্ষার পরিধি

- ১.৪.১ সম্পর্ক ও জনসংখ্যার সম্পর্ক
- ১.৪.২ জনসংখ্যার গতিপ্রকৃতি
- ১.৪.৩ জনসংখ্যার ও পরিবেশের সম্পর্ক
- ১.৪.৪ পাঠক্রম ও পাঠক্রমের বিষয়বস্তু
- ১.৪.৫ শিক্ষণ পদ্ধতি ও শিক্ষক শিক্ষণ
- ১.৪.৬ মূল্যায়ন
- ১.৪.৭ জনসংখ্যা শিক্ষা ও অন্যান্য বিদ্যা

১.৫ জনসংখ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্য

১.৬ জনসংখ্যা শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

১.৭ ভারতে জনসংখ্যা শিক্ষার কার্যক্রম

১.৮ সারসংক্ষেপ

১.৯ অনুশীলনী

১.১ সূচনা (Introduction)

১৭৯৮ সালে ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ্ টমাস রবার্ট ম্যালথস (Thomas Robert Malthus) জনসংখ্যা ও তার নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন জনসংখ্যা সম্বন্ধে সম্ভবত সেইটিই প্রথম পূর্ণাঙ্গ আলোচনা। তাঁর মতে সময়মত ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে, যুদ্ধ, মহামারী, দারিদ্র্য, অপুষ্টি, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ইত্যাদি নানা স্বাভাবিক কারণে অতিরিক্ত জনসংখ্যা ধ্বংস হয়ে জনসংখ্যার ভারসাম্য রক্ষা করবে। ম্যালথস যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছিলেন পরবর্তীকালে তা বহু সমালোচিত হলেও একটি বিষয়ে তার মতামতের গুরুত্ব সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা যায়নি। সেটি হল, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে উপরোক্ত সমস্যাগুলির অনিবার্য সম্পর্ক।

বিংশশতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে বিশ্বে নতুন করে সচেতনতা দেখা গেল। জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, অশিক্ষা, স্বাস্থ্যহীনতা, পুষ্টিহীনতা, প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হওয়া এমনি নানা বিষয়কে শুধুমাত্র জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফল হিসাবে বিশেষজ্ঞরা মানতে চাইলেন না। বরং তাঁদের মতে ঐগুলি জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ। এই জন্য ১৯৭০-এর দশকে জনসংখ্যা ও তার কারণ, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে সমস্ত মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হল। এই প্রয়োজন থেকেই জনসংখ্যা শিক্ষা (Population Education) নামক বিদ্যার উৎপত্তি। শিক্ষাবিজ্ঞানে জনসংখ্যা শিক্ষা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে স্থান পাওয়ার পর থেকে পঠন-পাঠন ও গবেষণার ক্ষেত্রে জনসংখ্যা শিক্ষাও বিশেষ স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছে। জনসংখ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে এই প্রথম পাঠে বিষয়টির সঙ্গে শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক পরিচিতি ঘটানো হবে।

১.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

- জনসংখ্যা শিক্ষার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- জনসংখ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি বলতে পারবেন।
- জনসংখ্যা শিক্ষার পরিধি ও অন্যান্য বিদ্যার সঙ্গে এর সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবেন।
- জনসংখ্যা শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানতে পারবেন।
- জনসংখ্যা শিক্ষা কার্যক্রমগুলি সম্বন্ধে ধারণা দিতে পারবেন।

১.৩ জনসংখ্যা শিক্ষার ধারণা (Concept of Population Education)

১৯৭০-এর দশকে যখন জনসংখ্যা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রবলভাবে অনুভূত হল তখনও এই নতুন বিষয়টির স্বরূপ, সংজ্ঞা ও ধারণা খুব স্পষ্ট ছিল না। শুধু একটি বিষয়ে সকলেই নিশ্চিত ছিলেন যে জনসংখ্যা শিক্ষার ভিত্তি একটি নেতিবাচক চিন্তাধারা থেকে ইতিবাচক চিন্তাধারায় উত্তরণের উপর দাঁড়িয়ে আছে।

নেতিবাচক চিন্তাধারাটি বহুদিন ধরেই প্রচার করা হচ্ছিল কিন্তু তাকে সংগঠিত তত্ত্ব হিসাবে প্রচার করে ক্লাব অব রোম (Club of Rome) নামক একটি গোষ্ঠী। ১৯৬৮ থেকে ১৯৭২-এর মধ্যে তারা নানাভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করে বিশ্বের দরিদ্র ও অনগ্রসর দেশগুলিতে বিপুল জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমস্ত রকম পরিবেশ দূষণ, প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস ও বিপর্যয়ের জন্য দায়ী। সুতরাং যে কোন মূল্যে, ছলে বলে কৌশলে এই সব দেশগুলিতে (প্রধানত এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলি) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। অর্থাৎ দরিদ্র দেশগুলির জনসংখ্যা সভ্যতার পক্ষে আপদ বিশেষ।

সুখের বিষয় অধিকাংশ জনসংখ্যাবিদ্, পরিবেশবিদ্ ও অর্থনীতি বিশারদরা এই মত মানেননি। সমস্ত রকম তাত্ত্বিক বিচার ও বাস্তব হিসাব নিকাশ থেকে দেখা যায় ধনী দেশের জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৫ ভাগ

মাত্র হলেও তারা মোট সম্পদের ৭৫ ভাগ তারাই ভোগ করে। বাকি ৭৫ শতাংশ মানুষের জন্য থাকে ২৫ শতাংশ সম্পদ মাত্র। দরিদ্র মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজন অতি সামান্য অথচ তারা দূষণহীন যে কায়িক শ্রম উৎপাদনের কাজে ব্যয় করে তার সম্পদমূল্য অসীম। সুতরাং জনসংখ্যাকে সম্পদ হিসাবে দেখতে হবে। এই সম্পদের উন্নয়ন অর্থাৎ, অনগ্রসর জনগণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জীবন যাত্রার মানোন্নয়নের মাধ্যমেই পরিবেশ সংরক্ষণ থেকে শুরু করে সম্পদের সদ্ব্যবহার ইত্যাদি সম্ভব হবে তেমনি জনসংখ্যাও স্বাভাবিকভাবেই নিয়ন্ত্রিত হবে। জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ শুধু মাত্র বিধিনিষেধ, আইন প্রণয়ন, নির্যাতন ইত্যাদির সাহায্যে কখনই সম্ভব হবে না। জীবনযাত্রার মানোন্নয়নই একমাত্র পন্থা।

জনসংখ্যা শিক্ষার মূল কথা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে যেসমস্ত সামাজিক, মানসিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত বিষয়গুলি সম্পৃক্ত সেগুলি ভালো করে বুঝে নিয়ে তার সাহায্যে একধরনের মানসিক প্রতিন্যাস (Attitude) ও মূল্যবোধের সৃষ্টি করা যা ব্যক্তির নিজস্ব জীবন, সন্তান উৎপাদন ও প্রতিপালন সম্বন্ধে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দান করবে। এই সংক্রান্ত যা কিছু জ্ঞান তা সমস্ত মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারলে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য আর কোন স্বতন্ত্র প্রয়াস দরকার হবে না।

এই ইতিবাচক ধারণার ভিত্তিতে জনসংখ্যা শিক্ষার সংজ্ঞা স্থির করা দরকার।

১.৩.১ জনসংখ্যা শিক্ষার সংজ্ঞা (Definition of Population Education)

জনসংখ্যা শিক্ষার সহজতম সংজ্ঞা হল, জনসংখ্যার প্রকৃতি, বৃদ্ধি, ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত যাবতীয় জ্ঞানের সমাহার (Assembly of all Knowledges concerning, the nature of population, population growth and its control)।

এই সংজ্ঞাটি অসম্পূর্ণ কারণ, এখানে কতগুলি প্রয়োজনীয় কিন্তু নিষ্ক্রিয় জ্ঞানের সমাহারকে বলা হয়েছে জনসংখ্যা শিক্ষা, যার উপাদান ও উদ্দেশ্য খুব একটা স্পষ্ট নয়। সেজন্য ভিন্নতর ভাবে বলা যায়, যে শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা, একদিকে জনসংখ্যার প্রকৃতি ও তাৎপর্য এবং অন্যদিকে জনসংখ্যা তার নিজের, চারপাশের পরিবেশের ও বিশ্বের বিভিন্ন শক্তিগুলির সঙ্গে সম্পর্ক অনুধাবন করার ভিত্তিতে জীবনের মান সম্বন্ধে বিশেষ মূল্যবোধ গড়ে তুলতে পারবে তাকেই বলে জনসংখ্যা শিক্ষা (The educational programme through which the learners will be able to develop a specific value system about the quality of life based on the understanding of the relation between himself, the environment around and the various forces of the world on the one hand and the nature and significance of population on the other, is called Population Education)

তাত্ত্বিক দিক থেকে এই সংখ্যাটি জনসংখ্যার শিক্ষার সমস্ত প্রসঙ্গগুলিকে স্পর্শ করেছে। যেমন,

- জনসংখ্যা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য জীবনের মান সম্বন্ধে একটি স্থায়ী ও বিশেষ মূল্যবোধ গড়ে তোলা।
- এই মূল্যবোধ গড়ে তোলার জন্য অনেকগুলি উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্কটি বোঝা দরকার।
- পারস্পরিক সম্পর্কিত বিষয়গুলির মধ্যে আছে জনসংখ্যার প্রকৃতি ও তাৎপর্য অনুধাবন করা।
- অন্যদিকে আছে ব্যক্তির সঙ্গে চারপাশের পরিবেশ ও বিশ্বের বিভিন্ন শক্তিগুলির (যেমন, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক ইত্যাদি) সম্পর্ক।

বলা বাহুল্য উপরোক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী জনসংখ্যা শিক্ষা একটি দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং যার উপাদান ব্যাপক ও বিস্তৃত।

আমাদের দেশে জনসংখ্যা শিক্ষার প্রকৃতি ও পাঠক্রম তৈরি করার উদ্দেশ্যে জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (The National Council of Educational Research and Training) প্রথম অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। তাঁরা প্রথম যে পাঠক্রমের খসড়া তৈরি করেছিলেন, তাতে জনসংখ্যা শিক্ষার সংজ্ঞা দিতে যেয়ে বলা হয়েছে, জনসংখ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে এমন যা শিক্ষার্থীদের বুঝতে সাহায্য করবে যে পরিবারের আকৃতি নিয়ন্ত্রণযোগ্য, জনসংখ্যা সীমিত রাখলে দেশে জীবনযাত্রার মান বজায় রাখায় সহায়ক হবে, এবং পরিবারের আকৃতি প্রত্যক্ষভাবে প্রতিটি একক পরিবারের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। তাছাড়াও তাদের বুঝতে সাহায্য করবে যে পরিবারের প্রতিটি সদস্যের স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক সুস্থিতি রক্ষা করার জন্য এবং তরুণ প্রজন্মের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার জন্য পরিবারের আকৃতি ছোট রাখা দরকার (The objective of population education should be to enable the students to understand that the family size is controllable, that population limitation can facilitate the development of higher quality of life in the nation and that a small family size can contribute materially to the quality of living for the individual family. It should also enable the students to appreciate the fact that, for preserving health and welfare of the members of the family, to ansure the economic stability of the family and to assure good prospects for the younger generation, the Indian families today and tomorrow should be compact and small)

NCERT প্রণীত খসড়াতে আরও বলা হয় সর্বস্তরের ছাত্রছাত্রীদের এই অধিকার থাকবে যে তারা পরিবারের আকৃতি পরিবর্তনের ও জাতীয় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ফলে কি কি পরিবর্তন হল এবং এই জ্ঞানের সাহায্যে পরিবার নিয়ন্ত্রণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনগণের মঙ্গল সাধন করার উপর সহায়ক প্রভাব ফেলা যাবে (Students at all levels have a right to acquire information about the effect of changes in family size and in national population on the individual, the family and the nation, so that this body of knowledge is utilised to control family size and national population with benefecial impact on the economic development of the nation and the welfare of the individual families)

NCERT প্রদত্ত সংজ্ঞাগুলিও তার অন্তর্গত উদ্দেশ্য কিছুটা সংকীর্ণ কেননা তা পরিবার পরিকল্পনা (Family planning) নামক কার্যক্রমের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়।

UNESCO (1971) জনসংখ্যা শিক্ষার নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দিয়েছেন,

"Population Education is our educational programme which provides for a study of the population situation in the family, country, nation and world with the purpose of development in the students of rational and responsible attitude and behaviour towards that situation"

অপরদিকে R. C. Sharma (1983) মনে করেন,

"Population education is an educational programme which helps learners to understand the interrelationship of population dynamics and other factors of quality of life and to

make informed and rational decisions with regard to population related behaviours with the purpose of improving quality of life of himself, his family, community, nation and the world."

বলা বাহুল্য UNESCO প্রদত্ত সংজ্ঞাটি অপেক্ষাকৃত সরল মনে হলেও পূর্ণাঙ্গ এবং অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

১.৩.২ জীবনযাত্রার মান (Quality of Life)

জনসংখ্যা শিক্ষার সংজ্ঞায় জীবনযাত্রার মান কথাটি বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু জীবনযাত্রার মান কথাটির প্রকৃত অর্থ কি তা বলা হয়নি। জীবনযাত্রার মান আপাতদৃষ্টিতে একটি আপেক্ষিক কথা, দেশ ও কালভেদে তার পরিবর্তন হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু জীবনযাত্রার জন্য মৌলিক চাহিদাগুলির ভিত্তিতে এবং ঐ সব মৌলিক চাহিদার পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে একথা স্পষ্টভাবেই বলা যায় যে জীবনযাত্রার মান একটি জটিল ধারণা। বৃহত্তর পটভূমিতে জীবনযাত্রার মান পাঁচটি প্রধান উপাদানের একটি জটিল সমন্বয়।

● **সম্পদ (Resource)** : সহজ কথায় যে বস্তু বা প্রকৃতির অংশ মানুষের হিতার্থে ব্যবহারের উপযোগী তাকেই বলা যায় সম্পদ। যা ব্যবহারোপযোগী নয় তা সম্পদ নয়। সমুদ্রের বায়ু প্রবল শক্তিধর, কিন্তু তা কোন সম্পদ নয়। কিন্তু যদি সেই সম্পদ ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা হয় তবে তা প্রাকৃতিক সম্পদ হিসাবে গণ্য হবে। মাথা পিছু সম্পদের ব্যবহার জীবনযাত্রার মান নির্দেশ করার অন্যতম সূচক। বিশেষজ্ঞরা পাঁচ প্রকার সম্পদকে চিহ্নিত করেছেন। যথা—

(১) **মানব সম্পদ (Human Resource)** : যে মানুষ কোনও না কোনভাবে কর্মক্ষম তার শ্রম, মেধা, বিদ্যা ইত্যাদি সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হয়।

(২) **খাদ্য (Food)** : খাদ্য সম্পদ আমাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ, জীবন ধারণ, স্বাস্থ্য রক্ষা ইত্যাদি সবকিছুর জন্য প্রয়োজন।

(৩) **ধন (Capital)** : ধন সম্পদ প্রত্যক্ষভাবে আমাদের চাহিদা পূরণ করতে পারে না কিন্তু চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু ক্রয় করায় ক্ষেত্রে অবশ্য প্রয়োজনীয়। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলভিত্তি ধন সম্পদ।

(৪) **প্রাকৃতিক সম্পদ (Natural Resource)** : প্রকৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত যাবতীয় বস্তু, প্রাণী, উদ্ভিদ ইত্যাদি যা কিছু আমাদের চাহিদা পূরণ করে এবং ধনসম্পদ যোগায় সবকিছুর একত্রিত নাম প্রাকৃতিক সম্পদ।

(৫) **প্রযুক্তি সম্পদ (Technological)** : প্রযুক্তি মানুষের সৃষ্টি করা সম্পদ। প্রযুক্তির সাহায্যে যে কোন সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, রূপান্তর ও অনুসন্ধান সম্ভব হয়। যে মানুষের জীবনযাত্রার মান যত উন্নত তার জীবনে প্রযুক্তির ভূমিকা ততই গুরুত্বপূর্ণ।

● **জীবনযাপনের স্তর (Level of living)** : যথেচ্ছ সম্পদের প্রাচুর্য জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করতে পারে না। প্রচুর খাদ্য সম্পদ ও যথেচ্ছ অপরিমিত আহার উন্নত জীবনযাপনের নির্দেশক নয়। এই ক্ষেত্রে যে পাঁচটি উপাদানের কথা বলা হয়েছে তা নিম্নরূপ :

(১) **জাতীয় মোট উৎপাদনের মাথাপিছু হার (Per capita (GNP)** : যে দেশের অর্থনীতি যত সবল সে দেশের জাতীয় মোট উৎপাদনের পরিমাণ বেশি এবং মাথাপিছু বন্টনের হার তত বেশি। জনসংখ্যা সীমিত থাকলে

মাথাপিছু বণ্টন বেশি হবে। বিপরীতক্রমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ মানুষ স্বেচ্ছায় পরিবারের আকৃতি সীমিত রাখতে উদ্যোগী হয়।

(২) **স্বাস্থ্য (Health) :** জীবনযাত্রার মান উন্নত হলে স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়ে, স্বাস্থ্য পরিসেবাও উন্নত হয়। সুতরাং জীবনযাত্রার মান ও স্বাস্থ্য পরস্পর নির্ভরশীল।

(৩) **বাসস্থান (Housing) :** যে দেশের জীবনযাত্রার মান যত উন্নত তার বাসস্থান ও বাসগৃহ ততই উন্নত হয়। বলাবাহুল্য উন্নত বাসস্থান ও বাসগৃহ, নগরায়ন ইত্যাদি অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর নির্ভরশীল।

(৪) **সামাজিক মঙ্গল (Social Welfare) :** উন্নত সমাজ উন্নত জীবনযাত্রার অপরিহার্য অঙ্গ। সামাজিক হিতসাধন কথাটির অর্থ কুসংস্কার মুক্ত, ভেদাভেদহীন, সৌহার্দ্যপূর্ণ সামাজিক পরিবেশে ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত অধিকার ও কর্তব্যবোধের সুষ্ঠু সমন্বয়।

(৫) **শিক্ষা (Education) :** শিক্ষার আনুভূমিক বিস্তার (Horigontal Spread) ও উল্লম্ব বৃদ্ধি (Vertical growth) এই দুই-ই জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের আবশ্যিক শর্ত। সর্বজনীন শিক্ষার বিস্তার, গুণগত ও উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ দান ও সুযোগ গ্রহণ জীবনযাত্রার মান উন্নত করে। জীবনযাত্রার মান নির্ণয় করার ক্ষেত্রে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অন্যতম সূচক হিসাবে সর্বত্র গৃহীত।

● **জনসংখ্যার গতিপ্রকৃতি (Population Dynamics) :** জনসংখ্যার গতিপ্রকৃতি জীবনযাত্রার মান নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচ্য বিষয়। এর অন্তর্গত উপাদানগুলি পাঁচটি।

(১) **জনসংখ্যা (Population) :** জনগণনার সাহায্যে প্রতি দশ বৎসর অন্তর দেশের মোট জনসংখ্যা স্থির করা হয়। জনসংখ্যা ও জীবনযাত্রার মান পরস্পর ব্যস্ত সমানুপাতিক (Invirsely proportional)।

(২) **বৃদ্ধির হার (Growth rate) :** জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার জীবনযাত্রার মান নির্ধারণের অন্যতম সূচক। আমাদের দেশে বৃদ্ধির হার বেশি, চিনে কম। সেজন্য চিনের উন্নয়ন অনেক বেশি দ্রুত ঘটেছে।

(৩) **বয়স অনুযায়ী গঠন (Age Structure) :** কোন বয়সের মানুষের সংখ্যা আনুপাতিক হারে কত তাকে বলে বয়স অনুযায়ী গঠন। কর্মক্ষম বয়সের মানুষ বেশি হলে উৎপাদনের উপর তার প্রভাব পড়ে। উন্নত দেশে জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়ায় দীর্ঘজীবী মানুষের সংখ্যা বেশি হতে পারে।

(৪) **স্থানান্তর গমন (Migration) :** উন্নত দেশের মানুষের মধ্যে স্থানান্তর গমনের প্রবণতা বেশি দেখা যায়। আবার বিপরীতক্রমে দারিদ্র ইত্যাদির কারণে কাজের সন্ধানে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অঞ্চল থেকে উন্নত অঞ্চলে চলে যেতে চায়।

(৫) **জন্ম মৃত্যুর হার (Birth and Death rate) :** অনুন্নত জীবনযাত্রায় জন্মহার বেশি মৃত্যুর হারও বেশি। বিশেষত শিশু মৃত্যু, প্রসূতির মৃত্যু, পেশাগত বিপর্যয়ের (Occupational hagard) দরুণ মৃত্যু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

● **সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি (Socio-Political System) :** সামাজিক রীতি-নীতি, প্রথা, বিশ্বাস ইত্যাদি এবং রাজনৈতিক নীতি কোন দেশের জীবনযাত্রার মান স্থির করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান সরবরাহ করে।

(১) **সামাজিক পরিস্থিতি (Social System) :** সামাজিক রীতিনীতি যেমন, বাল্যবিবাহ, কুসংস্কার, নানা

রকম কুপ্রথা, জাতিভেদ ইত্যাদি জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের পরিপন্থী। বিপরীত ক্রমে জীবনযাত্রার মান উন্নত হলে, ঐসব সামাজিক বিষয়গুলি ক্রমশ দূর হয়ে যায়।

(২) **ধর্মীয় মূল্যবোধ (Religion Values) :** ধর্মীয় গোঁড়ামি, ধর্মের ভিত্তিতে শোষণ করার প্রবণতা, উন্নয়ন বিরোধিতা, জীবনযাত্রার মান উন্নত করার পক্ষে প্রবল বাধা। জীবনযাত্রার মান উন্নত হলে, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নের ফলে, ধর্মীয় মূল্যবোধের ইতিবাচক দিকগুলিই কার্যকর থাকে।

(৩) **জীবন শৈলী (Life style) :** উন্নত জীবনযাত্রার পদ্ধতি ও প্রকরণ, অনুন্নত জীবন শৈলীর চেয়ে আলাদা। কাজ, অবসর যাপন, বিনোদন, দৈনন্দিন সূচি সবকিছুর ক্ষেত্রেই পরিবর্তন লক্ষ করা যায় যখন জীবন যাত্রার মান উন্নত হতে থাকে।

(৪) **সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ (Cultural Values) :** জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধেরও পরিবর্তন ঘটে।

(৫) **রাজনৈতিক পরিস্থিতি (Political System) :** একথা প্রায় প্রমাণিত সত্য যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ধীরে ধীরে হলেও সার্বিকভাবে জীবনযাত্রার মান ক্রমাগত উন্নত হতে থাকে। বিপরীত ক্রমে এক নায়কতন্ত্রী ব্যবস্থায় প্রথমদিকে দ্রুত উন্নতি হলেও শেষপর্যন্ত তা মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। বৃহত্তর জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান কোন প্রকারেই উন্নত হয় না।

● **বিকাশের প্রক্রিয়া (Process of Development) :** এই বিষয়টি মিশ্রভাবে অনেকগুলি বিষয়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। এর মধ্যে, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, নেতৃত্ব ইত্যাদি অসংখ্য বিষয় জড়িয়ে আছে।

(১) **ব্যবসা বাণিজ্য (Trade) :** কোন দেশের অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য, আন্তর্দেশীয় বাণিজ্য তথা আমদানি, রপ্তানি, উৎপাদন ইত্যাদির উপর তার উন্নয়ন নির্ভর করে।

(২) **বিকাশের অগ্রাধিকার (Developmental Priorities) :** দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে তা নির্ভর করে রাজনৈতিক নেতৃত্ব, প্রশাসনিক দূরদর্শিতা, সাম্য ও ন্যায়বিচার সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদির উপর। উপযুক্ত অগ্রাধিকার স্থির করার উপর নির্ভর করে জীবনযাত্রার মান কতটা উন্নত হবে এবং কত দ্রুত উন্নত হবে।

(৩) **অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (Economic System) :** কোন কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এক শ্রেণির মানুষ ক্রমাগতই ধনী হয়, অন্যরা ক্রমাগত দরিদ্র হয়। আবার অন্য ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সকলেরই উন্নতি হতে পারে।

(৪) **আন্তর্জাতিক সম্পর্ক (International relation) :** আধুনিক পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম চালিকা শক্তি।

(৫) **সাহায্য (Aid) :** আর্থিক, প্রযুক্তিগত, মেধাবিষয়ক, পেশাদারি ইত্যাদি যে কোন সহায়তাই এই বিষয়টির অন্তর্গত। অনেক সময়ই যে সব দেশ নিজস্ব প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনে অক্ষম, তারা অন্য দেশের প্রযুক্তির সাহায্যে জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে চেষ্টা করে। যেমন, চিকিৎসায় ব্যবহৃত কোন দামী যন্ত্র সাহায্য হিসাবে একটি হাসপাতালে দান করলে, তারা উন্নততর চিকিৎসা পরিসেবা দিতে পারে। অপরিশোধযোগ্য ঋণ সুদহীন ঋণ ও সাহায্য হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

১.৪ জনসংখ্যা শিক্ষার পরিধি (Scope of Population Education)

জনসংখ্যা শিক্ষার পরিধি খুব একটা স্পষ্ট বা সীমিত নয়। কারণ জনসংখ্যার সঙ্গে এত অজস্র ও বিচিত্র বিষয় যুক্ত হয়ে আছে যে জনসংখ্যা সংখ্যা শিক্ষায় কি অন্তর্ভুক্ত হবে বা হবে না তা স্থির করা কঠিন। এখানে কয়েকটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হল।

১.৪.১ সম্পদ ও জনসংখ্যার সম্পর্ক (Relation between Resource and Population)

ইতিপূর্বে জীবনযাত্রার মান প্রসঙ্গে সম্পদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। জনসংখ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে সম্পদ সম্পর্কে জ্ঞান একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। সম্পদ কাকে বলে, সম্পদ কত প্রকারের হয়, সম্পদের উৎপাদন, পুনর্ব্যবহার, অপচয় ইত্যাদি প্রসঙ্গগুলির সঙ্গে জনসংখ্যার দ্বিমুখী সম্পর্ক বর্তমান। সম্পদের সদ্ব্যবহার হলে জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। আবার জীবনযাত্রার মান উন্নত হলে সম্পদ সৃষ্টি ও সদ্ব্যবহার হয়।

১.৪.২ জনসংখ্যার গতিপ্রকৃতি (Population Dynamics)

এই বিষয়টি জনসংখ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও প্রকৃতি অনেকগুলি বল দ্বারা (Force) নিয়ন্ত্রিত হয়। এর মধ্যে প্রধান বিষয় জন্ম ও মৃত্যুর আনুপাতিক হার, নারী ও পুরুষের অনুপাত, বিভিন্ন বয়সের নারী ও পুরুষের সংখ্যার অনুপাত অর্থাৎ যে বিষয়গুলি মূলত জনবিজ্ঞানের (Demography) চর্চার বিষয়। সেই সঙ্গে জানা দরকার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলি কি কি এবং প্রজনন সংক্রান্ত স্বাস্থ্য (Reproductive health) ও জনসংখ্যার উপর তার প্রভাব।

১.৪.৩ জনসংখ্যা ও পরিবেশের সম্পর্ক (Relation between Population and Environment)

পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা ও দূষণের জন্য এক সময় একতরফা ভাবে দরিদ্র দেশের জনসংখ্যাকে দায়ী করা হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরিবেশের সঙ্গে জনসংখ্যার সম্পর্ক কোথায়। দূষণের প্রকৃত কারণগুলি কি কি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক কি এই সব বিষয়গুলিও জনসংখ্যার শিক্ষার অন্যতম চর্চার বিষয়। কারণ জীবপরিমণ্ডলের অস্তিত্ব নির্ভর করে যে ভারসাম্যের (Ecology) উপর এবং যে খাদ্য-খাদক শৃংখল প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সেই শৃংখলের মধ্যে কিভাবে বিশৃংখলা দেখা দেয় তা জানা থাকলে সকলেই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য সচেষ্ট হতে পারবেন। বিপরীত ক্রমে খাদ্য-খাদক শৃংখলটি সযত্নে রক্ষা করার উদ্যোগ গ্রহণ করার মধ্যে দিয়ে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণেও উদ্যোগী হবেন।

১.৪.৪ পাঠক্রম ও পাঠক্রমের বিষয়বস্তু (Curriculum and Curriculum Content)

জনসংখ্যা শিক্ষার সূচনা বিদ্যালয় স্তরেই করতে হবে। কিন্তু বিদ্যালয়ে অবশ্যপাঠ্য বিষয়গুলির অতিরিক্ত একটি বিষয় হিসাবে জনসংখ্যা শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করার অনেক সমস্যা আছে। আবার প্রচ্ছন্নভাবে অন্য বিষয়গুলির মধ্যে জনসংখ্যা শিক্ষার প্রসঙ্গটি অন্তর্ভুক্ত করে দিলে, তাতে সত্যিকারের কোন ফল পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। সুতরাং পাঠক্রম তৈরির মূল নীতিগুলি কি ও বিষয়বস্তু নির্বাচন কিভাবে করা সঙ্গত এই বিষয়টিও জনসংখ্যা শিক্ষার অন্যতম আলোচ্য প্রসঙ্গ।

১.৪.৫ শিক্ষণ পদ্ধতি ও শিক্ষক শিক্ষণ (Teaching Method and Teachers' Training)

যে কোন বিদ্যার সার্থকতা সঠিক শিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে জনসংখ্যা শিক্ষার বিষয়বস্তুর মধ্যে এমন কিছু কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে যা পড়ানোর জন্য বিশেষ কিছু শিক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োজন হতে পারে। এই কারণে শিক্ষকদের স্বতন্ত্র্যভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়ারও গুরুত্ব আছে। সে হিসাবে শিক্ষণ পদ্ধতি ও শিক্ষক শিক্ষণও জনসংখ্যার শিক্ষার অন্তর্গত বিষয়।

১.৪.৬ মূল্যায়ন (Evaluation)

পরীক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে অন্য আর পাঁচটা বিষয়ের মত একই পদ্ধতিতে জনসংখ্যা শিক্ষার মূল্যায়ন করাতেও বেশ কিছু সমস্যা আছে। কারণ, এই বিদ্যার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র তাৎক্ষণিক জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে পরীক্ষা পাশ করা নয়। চূড়ান্তভাবে এর প্রকৃত সার্থকতা তখনই বোঝা যাবে যখন জনসংখ্যা শিক্ষা সত্যিই জীবনযাত্রার মান ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে। সেজন্য জনসংখ্যা শিক্ষার মূল্যায়ন ব্যবস্থাও পাঠ্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সবশেষে জনসংখ্যার উদ্দেশ্যগুলির ভিত্তিতে এবং জীবনযাত্রার মান ব্যাখ্যা করতে যেয়ে যে সব প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি বিচার করলে দেখা যাবে জনসংখ্যা শিক্ষার পরিধি এতই বিস্তৃত যে, যে কোন সংশ্লিষ্ট বিষয়ই এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

১.৪.৭. জনসংখ্যা শিক্ষা ও অন্যান্য বিদ্যা (Population Education and Other Disciplines)

পূর্ববর্তী পাঠ্যাংশের আলোচনা থেকে প্রাথমিকভাবে এই ধারণা পাওয়া যায় যে জনসংখ্যা শিক্ষা অনেক বিষয় থেকেই প্রয়োজনীয়, তথ্য ও পদ্ধতি গ্রহণ করে একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানে কয়েকটি বিষয় এবং জনসংখ্যার শিক্ষায় তাদের অবদান সম্বন্ধে উল্লেখ করা হল। বলা বাহুল্য নিঃশেষে সমস্ত বিষয় এবং অবদান উল্লেখ করা হয়নি, এগুলি নমুনা মাত্র।

ভূগোল (Geography) : আঞ্চলিক ও ভৌত ভূগোল বিদ্যা দুই-ই আমাদের বুঝতে সাহায্য করে পৃথিবীতে জনসংখ্যার ঘনত্ব ও তার পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে। সেই সঙ্গে কৃষি, খনিজ সম্পদ, শিল্প, শিক্ষা এগুলির বিস্তার বনাঞ্চল, নদী, পর্বত ইত্যাদি মানব জীবনে যে প্রভাব বিস্তার করে এবং ভূগোল বিদ্যার তত্ত্ব ও পদ্ধতি জনসংখ্যার স্বরূপ বুঝতে সাহায্য করে।

অর্থনীতি (Economics) : সম্পদ ও তার বন্টন, সম্পদের অর্থনৈতিক ভিত্তি এবং জনসংখ্যার সঙ্গে সম্পদের সম্পর্ক বুঝতে সাহায্য করে অর্থনীতি।

মনোবিজ্ঞান ও সমাজ মনোবিজ্ঞান (Psychology and Social Psychology) : মানুষের আচরণের মূল নীতি ও কার্যকারণ সম্পর্ক বুঝতে সাহায্য করে। দলবদ্ধ মানুষের আচরণ, তাদের বিশ্বাস, সামাজিক আচরণের চালিকা শক্তিগুলিকে বুঝতে সাহায্য করে।

সমাজবিদ্যা (Sociology) : সমাজ বিদ্যার নীতিগুলি, সমাজের বিবর্তন ও উৎপত্তি, সমাজের গতিশীল স্বরূপ ইত্যাদি আমাদের বুঝতে সাহায্য করে জনসংখ্যার সামাজিক সত্ত্বা কি।

জন বিদ্যা (Demography) : জন সংখ্যার গঠন ও তার তাৎপর্য, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা (Projection), বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক পরিবর্তনের ফলে জনসংখ্যার পরিবর্তন ইত্যাদি বুঝতে সাহায্য করে।

গণিত ও রাশি বিজ্ঞান (Mathematics and Statistics) : জনসংখ্যা বিষয়ক গাণিতিক মডেল ও তথ্যের সুচারু বিন্যাস জনসংখ্যা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অপরিহার্য।

জীবন বিজ্ঞান (Life Science) : জীববিদ্যা (প্রাণী বিদ্যা ও উদ্ভিদ বিদ্যা), শরীর বিদ্যা (Physiology) ইত্যাদি বিষয়গুলি জীব জগৎ সম্বন্ধে, প্রজনন সম্বন্ধে এবং পরিবেশের প্রভাব সম্বন্ধে তথ্য সরবরাহ করে।

পরিবেশ বিজ্ঞান (Environmental Science) : এই বিষয়টির সঙ্গে জনসংখ্যা শিক্ষার সম্পর্ক বার বার উল্লেখ করা হয়েছে।

শিক্ষা ও শিক্ষণ বিজ্ঞান (Education and Pedagogy) : বলা বাহুল্য জনসংখ্যা শিক্ষার মূলনীতি ও শিক্ষণ পদ্ধতি শিক্ষা ও শিক্ষণ বিজ্ঞানের নীতি পদ্ধতি দ্বারাই স্থির করা হয়।

১.৫ জনসংখ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্য (Objectives of Population Education)

জনসংখ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধারণভাবে শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। শিক্ষার তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য প্রজ্ঞাবর্গ (Cognitive Domain), অনুভব বর্গ (Affective Domain) এবং সঞ্চালন বর্গ (Psychomotor Domain) নামে পরিচিত ও সেই অনুযায়ী এদের শ্রেণিবিন্যাস করার কথা শিক্ষা বিজ্ঞানের সমস্ত ছাত্রছাত্রীই জানেন।

প্রজ্ঞামূলক উদ্দেশ্য (Cognitive Objectives) : জনসংখ্যা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি জানা (Knowledge) তথ্যগুলির যথাযথ বোধ হওয়া (Comprehension), তথ্যগুলির প্রয়োগ (Application) তথ্যের বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ (Analysis and Synthesis) ইত্যাদির মাধ্যমে ধাপে ধাপে মূল্যায়ন (Evaluation) পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছানোই প্রজ্ঞামূলক লক্ষ্যের চূড়ান্ত পরিণতি। অর্থাৎ শুধুমাত্র তথ্য সংগ্রহ নয়, পূর্ণাঙ্গ তাৎপর্য অনুধাবন করে জনসংখ্যা সম্পর্কিত বিষয়, কার্যক্রম, পদ্ধতি, ইত্যাদির কোনটি গ্রহণযোগ্য কোনটি নয়, এই বিচারবোধ তৈরি হলে জনসংখ্যা শিক্ষা প্রকৃত সার্থক হবে।

অনুভবমূলক উদ্দেশ্য (Affective Objectives) : জনসংখ্যা শিক্ষার অনুভবমূলক উদ্দেশ্যের চূড়ান্ত পর্যায় হল মূল্যবোধ গঠন (Development of value system)। অনেক জনসংখ্যা শিক্ষাবিদ্ প্রজ্ঞামূলক উদ্দেশ্যের চেয়েও মূল্যবোধ গঠনের উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাদের মতে জনসংখ্যা শিক্ষার মাধ্যমে যদি মূল্যবোধ না গড়ে ওঠে তবে শুধুমাত্র জ্ঞান কোন কাজে লাগবেনা। মূল্যবোধের আচরণগত প্রকাশ ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রতিন্যাসের মাধ্যমে পরিস্রবণ হয়ে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ জনসংখ্যা, জীবনযাত্রার মান, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিয়ন্ত্রণকারী শক্তিগুলির মধ্যে অবাঞ্ছিত বিষয়গুলির প্রতি নেতিবাচক প্রতিন্যাস (Negative attitude) এবং বাঞ্ছিত বিষয়গুলির প্রতি ইতিবাচক প্রতিন্যাস (Positive attitude) ব্যক্তির আচরণের ভালোমন্দকে নিয়ন্ত্রণ করে। এর পিছনে কাজ করে তাদের সামগ্রিক মূল্যবোধ। জনসংখ্যা শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর মধ্যে মূল্যবোধ তৈরি করা এবং উপযুক্ত বিষয়গুলির প্রতি নেতিবাচক ও ইতিবাচক প্রতিন্যাস গড়ে তোলা।

সঞ্চালনমূলক উদ্দেশ্য (Psychomotor Objectives) : সঞ্চালনবর্গের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য সৃজন (Origination)। জনসংখ্যা সংক্রান্ত শিখনের ভিত্তিতে চূড়ান্ত পর্যায়ে জনসংখ্যা বিষয়ে ও তার অন্যান্য প্রাসঙ্গিক

বিষয়ে মৌলিক চিন্তাভাবনা, কার্যক্রম স্থির করা, নিজের ও চারপাশের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সক্রিয় ও নিজস্ব পদ্ধতি অবলম্বন করা বা অনুরূপ ক্ষমতার অধিকারী হতে পারবে শিক্ষার্থীরা। সক্রিয় আচরণের আদর্শ সৃষ্টি করা, আদর্শ গ্রহণ, বর্জন ও বিচার করার মধ্যে দিয়ে যে সব কার্যক্রম, আচরণ জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সহায়ক ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক সেগুলিকে জীবনচর্যার অঙ্গীভূত করে নেওয়াই জনশিক্ষা শিক্ষার অন্তিম উদ্দেশ্য।

বিষয়গুলি শিক্ষাবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীরা ইতিমধ্যেই বিশদভাবে জেনেছেন। সেজন্য বিস্তারিত ব্যাখ্যা এক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন।

উপরোক্ত বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়াও জনসংখ্যা শিক্ষার যেসব প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য পূর্ববর্তী অংশগুলিতে উল্লেখ করা হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিচে দেওয়া হল।

- পরিবারের আকৃতি ছোট রাখার জন্য সচেতনতা ও প্রয়াস।
- স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনের গুরুত্ব অনুধাবন করার শিক্ষা।
- নারী ও পুরুষের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা এবং পরস্পরের মূল্যবান ভূমিকার স্বীকৃতি।
- সুস্থ যৌন জীবন যাপন ও যৌনরোগ প্রতিরোধ করার সচেতনতার বিকাশ।
- সম্পদের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে সচেতন হওয়া এবং সম্পদের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে অপচয় বন্ধ করার মানসিকতা।
- সকলের জন্য শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন ও শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ।
- শিশু শ্রম বন্ধ করে মানব সম্পদ হিসাবে শিশুর শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতনতা।
- ব্যক্তিগত, পারিবারিক অথবা আঞ্চলিক গণ্ডীর বাইরে বৃহত্তর জগতের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক সম্বন্ধে ধারণা গঠন, উদার মানসিকতার প্রসার।
- পরিবেশ সচেতনতা ও পরিবেশ রক্ষার জন্য সক্রিয় প্রয়াস।

১.৬ জনসংখ্যা শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (Brief Hisory of Population Education)

জনসংখ্যা শিক্ষার ইতিহাস খুব দীর্ঘ নয়। সম্ভবত 1941 সালে Alva Myrdal তাঁর গ্রন্থে (Nation and Family, 1941) আমেরিকার জনসাধারণকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে সামাজিক নীতি প্রণয়নের জন্য জনসংখ্যা নীতি (Population Policy) একান্ত আবশ্যক। এই বিষয়ে তিনি সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছিলেন শিক্ষার উপর। বিশেষভাবে পারিবারিক জীবন যাপনের শিক্ষার উপর। কিন্তু পরবর্তী দুই দশক বিষয়টি নিয়ে আর কোন উদ্যোগ বা চিন্তাভাবনা দেখা যায়নি।

কলম্বিয়া শ্বিবিদ্যালয়ের Tachers College Record (March, 1962) নামক পত্রিকায় Warren S. Thomson জনবিস্ফোরণ (Population Explosion) শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। অপর একটি প্রবন্ধ Population-Gap in the Curriculum লেখেন Philip M. Hanser ; এরা দুজনেই বিদ্যালয় পাঠক্রমে

জনসংখ্যার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। ঐ একই বিশ্ববিদ্যালয়ে 1964 সালে বিদ্যালয়ে জনসংখ্যা শিক্ষার পাঠক্রম তৈরি করার জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এর নেতৃত্বে ছিলেন অধ্যাপক Sloan Wayland যিনি Teaching Population Dynamics ও Critical stages of Reproduction নামক দুটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন প্রধানত শিক্ষক শিক্ষণের উদ্দেশ্যে।

কিন্তু এই সব ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ব্যাপকভাবে বিস্তার করতে পারেনি। UNESCO-র প্রধান (Director General Sir Julian Huxley) 1948 সালে যে বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেন তাতে তিনি মন্তব্য করেন নির্বিকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি ভবিষ্যৎ মানব সভ্যতাকে প্রবলভাবে ক্ষতি করতে পারে। তিনি বিশেষভাবে চিন্তিত ছিলেন অপুষ্টি, ভূমিক্ষয় ও প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংসের সম্ভাবনা সম্পর্কে। তিনিও জনসাধারণকে এই বিষয়ে শিক্ষিত করে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

কিন্তু 1968 সালের পূর্বে UNESCO এই প্রসঙ্গে আর কোন উদ্যোগ নেয়নি। 1968 তে UNESCO-র সাধারণ অধিবেশনে জন সাধারণকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রসঙ্গে সচেতন করা ও শিক্ষা দেওয়ার বিষয়টি আলোচিত হয়। এবং 1970 সালে মহা নির্দেশককে দায়িত্ব দেওয়া হয় যাতে সমস্ত সদস্য দেশগুলিকে সচেতনভাবে জনসংখ্যা শিক্ষার উদ্যোগ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় তার জন্য। দুই বছর পর 1972 সালে জনসংখ্যার প্রকৃতি সম্বন্ধে তথ্য ও শিক্ষার প্রসঙ্গে বিশ্ববাসীকে সচেতন করে তোলার জন্য, জনসংখ্যা শিক্ষার প্রসারের জন্য সমস্ত দেশকে যাতে বিশেষভাবে চাপ দেওয়া হয় সেই উদ্দেশ্যে মহানির্দেশকের উপর পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

এর মধ্যে 1970 সালে ব্যাঙ্ককে UNESCO-র এশিয়া আঞ্চলিক অফিসে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয় 'The Workshop on Population and Family Education নামে। এই হিসাবে বর্তমান জনসংখ্যা শিক্ষার প্রকৃত সূচনা ব্যাঙ্কক সম্মেলন থেকেই হয়েছিল বলে ধরে নেওয়া যায়। এখানে যে বিষয়গুলি সম্বন্ধে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তার মধ্যে আছে—

- জনসংখ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয়।
- জনসংখ্যা শিক্ষার সাংগঠনিক উদ্যোগের পদ্ধতি।
- বিদ্যালয় পাঠক্রমে জনসংখ্যা শিক্ষার রূপরেখা স্থির করা।
- সমাজবিদ্যা, প্রকৃতি বিজ্ঞান ও গণিতের পাঠক্রমে জনসংখ্যার উপাদানগুলি সংযোজন ও চিহ্নিত করে বিষয়বস্তুর একটি খসড়া তৈরি করা।

এই সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশগুলির সক্রিয় সহযোগিতায় প্রথম জনসংখ্যা শিক্ষার একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা তৈরি হয়। তবে বিভিন্ন দেশে এই বিষয়টিকে বিদ্যালয় স্তরে অন্তর্ভুক্ত করা খুব সহজ হয়নি। প্রবল বাধা আসে গোঁড়া নৈতিকতার অজুহাতে এবং নতুন ধ্যানধারণা গ্রহণের অনীহা থেকে। শিক্ষক শিক্ষিকা থেকে শুরু করে অভিভাবক সকলেই এর বিরোধিতা করেছেন এক সময়ে যার কিছুটা এখনও বিদ্যমান। প্রাথমিক বাধা কাটিয়ে প্রথমে পাঁচটি দেশ জনসংখ্যা শিক্ষার পরিকল্পনা কার্যকর করে এবং United Nations Fund for Population Activities (UNFPA)-এর আর্থিক সহায়তায় ও UNESCO-র প্রযুক্তিগত সাহায্যে নানা কর্মশালার আয়োজন হয়। 1983 সালের মধ্যে পঁচিশটি দেশে জনসংখ্যা শিক্ষার কার্যক্রম গৃহীত হয় যা বিগত কুড়ি বছরে ক্রমবর্ধমান।

প্রথম যে সমস্ত দেশে এই উদ্যোগ নেওয়া হয় ভারত তার মধ্যে অন্যতম। The Family Planning

Association of India মহারাষ্ট্র সরকারের কাছে জনসংখ্যা শিক্ষাকে বিদ্যালয় পাঠক্রমের অন্তর্ভূক্ত করার জন্য আবেদন করে। তার ভিত্তিতে এই বিষয়ের আনুকূল্যে একটি প্রস্তাব নেওয়া হয়। তবে তাতে স্পষ্ট বলা হয় যে জনসংখ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্য বিশেষ বিশেষ জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া নয়।

1969 সালে বর্তমান মুম্বাই শহরে প্রথম জনসংখ্যা শিক্ষার জাতীয় আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। তার ভিত্তিতে মানব সম্পদ বিকাশ মন্ত্রক UNFPA'র আর্থিক সহায়তা National Population Education Programme চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বর্তমানে অধিকাংশ রাজ্যেই জনসংখ্যা শিক্ষার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে জীবনশৈলী শিক্ষা (Life Style Education) নামে বিষয়টি প্রচলিত। এই সঙ্গে উল্লেখ করা দরকার শিক্ষক শিক্ষণ পাঠক্রমগুলিতে প্রায় সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ই জনসংখ্যা শিক্ষাকে অন্যতম বিষয় হিসাবে স্থান দিয়েছে।

১.৭ ভারতে জনসংখ্যা শিক্ষার কার্যক্রম (Programmes of Population Education in India)

জনসংখ্যা শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে বলা হয়েছে, 1969 সাল থেকে ভারতে জনসংখ্যা শিক্ষার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও তার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে তৎকালীন রাষ্ট্রনেতারা চিন্তিত ছিলেন। সেজন্য 'পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম' (Family Planning Programme) দীর্ঘকাল পূর্বেই গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু পরিবার পরিকল্পনার মধ্যে জনসংখ্যা শিক্ষার একটি উদ্দেশ্য নিহিত থাকলেও তাতে শিক্ষার কোন ব্যাপার ছিল না। মূলত প্রচার জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং কখনও কখনও জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশেষ আর্থিক সুযোগ সুবিধা দানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সেই সঙ্গে জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়াজনীয় উপকরণ ও চিকিৎসার সুযোগ বিনামূল্যে অথবা নামমাত্র মূল্যে বিতরণ করার ব্যবস্থা হয়েছিল। এর ফলে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে জন্ম নিয়ন্ত্রিত হলেও বিপুল সংখ্যক নিরক্ষর বা স্বল্প শিক্ষিতদের মধ্যে তার বিশেষ প্রভাব পরেনি।

পরোক্ষভাবে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কীয় সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতির উদ্দেশ্যও ছিল সামগ্রিকভাবে জীবনের গুণগত মান বৃদ্ধি করা, এবং জাতীয় অগ্রগতির বাধাগুলি অপসারিত করা। প্রতিটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেই এই বাবদে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে এবং 2001 সালে সর্বশিক্ষা অভিযানের যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তাও জনসংখ্যা শিক্ষার একটি উদ্দেশ্যকে সফল করবে। কারণ বর্তমানে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত যে শিক্ষার প্রসারের ফলে জন্মহার ক্রমশ কমতে থাকে।

শিশুশ্রম নিরোধক আইন, জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি, নারীর শিক্ষা ও ক্ষমতায়ন, অনগ্রসর শ্রেণির শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক সংরক্ষণ সংক্রান্ত সমস্ত পদক্ষেপগুলিই জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রহণ করা হয়েছিল। এমনকি দারিদ্র দূরীকরণ, গ্রামীণ রোজগার যোজনা, গ্রামীণ আবাসন যোজনা ইত্যাদি যা কিছু পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এবং আর্থিক বরাদ্দ করা হয়েছে তাও সামগ্রিকভাবে জাতীয় জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যেই। এক কথায় বলা চলে।

- একদিকে সরাসরি জনসংখ্যা শিক্ষাকে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করে বিষয়টিকে পঠন-পাঠনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- অন্যদিকে বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসাধারণের সার্বিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে জনসাধারণকে নিশ্চিতভাবে বোঝানোর চেষ্টা হচ্ছে যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণই সমস্ত উন্নয়নের ভিত্তি।
- আর সেই সঙ্গে AIDS প্রভৃতি মারণ রোগ প্রতিরোধ করার মাধ্যমেও বিদ্যালয় বহির্ভূত পদ্ধতি জনসংখ্যা শিক্ষার পরোক্ষ আয়োজন করা হচ্ছে।

১.৮ সারসংক্ষেপ (Summary)

জনসংখ্যা শিক্ষার উদ্যোগ প্রধানত বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নেওয়া হয়েছিল। এই বিষয়টির ধারণাগত ভিত্তি একটি দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন। জনসংখ্যাকে বিপদ হিসাবে চিন্তা না করে সম্পদ হিসাবে গ্রহণ করা এই পরিবর্তন সূচিত করে। জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে মানব সম্পদকে আরও কার্যকর ও ক্ষমতাশালী করে তুললে জনসংখ্যা স্বাভাবিক নিয়মেই নিয়ন্ত্রিত হবে— এই ধারণাই জনসংখ্যা শিক্ষার ভিত্তি।

জনসংখ্যা শিক্ষার সংজ্ঞা নানাভাবে দেওয়া হয়েছে। সংজ্ঞায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে জীবনের মান সম্বন্ধে স্থায়ী মূল্যবোধ গড়ে তোলার উপর। সেই সঙ্গে জনসংখ্যা শিক্ষার উপাদানগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও জনসংখ্যার উপর তার প্রভাবের প্রসঙ্গটিও জনসংখ্যা শিক্ষায় স্থান পেয়েছে। জনসংখ্যা শিক্ষার NCERT প্রদত্ত সংজ্ঞাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য যদিও এই সংজ্ঞায় পরিবার পরিকল্পনার প্রসঙ্গটি সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে।

জনসংখ্যা শিক্ষার সঙ্গে জীবনযাত্রার মান বিশেষভাবে সম্পর্কিত। জীবনযাত্রার মান প্রধানত পাঁচটি সূচক দ্বারা নির্মিত হয়। যেমন, সম্পদ, জীবন যাপনের স্তর, জনসংখ্যার গতি প্রকৃতি, সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও বিকাশের প্রক্রিয়া। এই পাঁচটি সূচক আবার পাঁচটি করে উপসূচকের উপর নির্ভরশীল। সেজন্য বলা হয় জীবনযাত্রার মান একটি জটিল পরিবর্তনশীল ও কখনও আপেক্ষিক ধারণা।

জনসংখ্যা শিক্ষার পরিধির অন্তর্গত বিষয়গুলির মধ্যে আছে, সম্পদ ও জনসংখ্যার সম্পর্ক, জনসংখ্যার গতিপ্রকৃতি, জনসংখ্যা ও পরিবেশের সম্পর্ক, পাঠক্রম ও পাঠক্রমের বিষয়বস্তু, শিক্ষণ পদ্ধতি ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং সবশেষে মূল্যায়ন। জনসংখ্যা শিক্ষার উপাদানগুলি অন্যান্য বিষয় থেকে অনেকাংশে গৃহীত হয়। এই সব বিষয়ের মধ্যে ভূগোল, অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান ও সমাজ মনোবিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা, জনবিদ্যা, গণিত ও রাশিবিজ্ঞান জীবন বিজ্ঞান, পরিবেশ বিজ্ঞান, শিক্ষা ও শিক্ষণ বিজ্ঞান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জনসংখ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি সাধারণভাবে শিক্ষার তিনটি প্রধান উদ্দেশ্যের দ্বারা স্থির করা হয়। এই তিনটি প্রজ্ঞামূলক, অনুভবমূলক ও সঞ্চালনমূলক উদ্দেশ্য ছাড়াও প্রত্যক্ষভাবে যে সব উদ্দেশ্যের কথা বিভিন্ন লেখক বলেছেন তার মধ্যে আছে, পরিবার সীমিতকরণ, স্বাস্থ্যকর জীবন যাপন, নারী-পুরুষের শ্রদ্ধাশীল মনোভাব গঠন, সম্পদের সদ্ব্যবহার, সুস্থ যৌন জীবন যাপন, পরিবেশ সচেতনতা ইত্যাদি।

সবশেষে জনসংখ্যা শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে এর উৎপত্তি ও বিস্তারের রূপরেখা দেওয়া হয়েছে এবং

UNESCO'র ভূমিকা বর্ণনা করা হয়েছে। আমাদের দেশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পরিকল্পনা ও কার্যক্রমগুলির উল্লেখ করা হয়েছে সবশেষে।

১.৯ অনুশীলনী

1. অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Very Short Answer Questions)

(ক) জনসংখ্যা শিক্ষার একটি সংজ্ঞা দিন।

(খ) জনসংখ্যাকে আপদ হিসাবে বিবেচনা করার দৃষ্টিভঙ্গিটি কী?

(গ) সম্পদ কথাটির অর্থ কী?

(ঘ) স্বাস্থ্যের সঙ্গে জীবনযাত্রার মানের সম্পর্ক কী?

(ঙ) বয়স অনুযায়ী জনসংখ্যার গঠন কাকে বলে?

(চ) জীবন যাত্রার মান সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভূমিকা কী?

(ছ) জনসংখ্যার গতি প্রকৃতি কাকে বলে?

(জ) ভূগোলের সঙ্গে জনসংখ্যা শিক্ষার সম্পর্ক কী?

(ঝ) জনসংখ্যা শিক্ষায় জনবিদ্যার অবদান কী?

(ঞ) জনসংখ্যা শিক্ষার যে সব প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য আছে তার যে কোন দুটির উল্লেখ করুন।

(ট) জনসংখ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে Sloan Wayland-এর ভূমিকা কী?

(ঠ) UNFPA কী?

2. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Short Answer Questions)

(ক) জনসংখ্যা শিক্ষার NCERT প্রদত্ত সংজ্ঞাটিকে সংকীর্ণ বলা হয়েছে কেন?

(খ) জীবনযাপনের মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে জীবনযাপনের স্তর কীভাবে বিচার করা হয় আলোচনা করুন।

(গ) জীবন যাপনের মান ও সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির সম্পর্ক আলোচনা করুন।

(ঘ) শিক্ষণ পদ্ধতি, শিক্ষক শিক্ষণ ও মূল্যায়নকে কেন জনসংখ্যা শিক্ষার পরিধির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে?

(ঙ) জনসংখ্যা শিক্ষায় অনুভবমূলক উদ্দেশ্যের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

(চ) জনসংখ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে UNESCO'র ভূমিকা সংক্ষেপে উল্লেখ করুন।

3. রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay Questions)

(ক) জনসংখ্যা শিক্ষার সংজ্ঞা ও পরিধি আলোচনা করুন।

(খ) উদাহরণসহ জনসংখ্যা শিক্ষার সঙ্গে অন্যান্য বিদ্যার সম্পর্ক বিস্তারিত আলোচনা করুন।

(গ) জনসংখ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) জীবনযাপনের মান যে সব সূচকের উপর নির্ভরশীল তা বিশদভাবে আলোচনা করুন।

(ঙ) জনসংখ্যার শিক্ষার ইতিহাস সংক্ষেপে লিখুন এবং সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমগুলি উল্লেখ করুন।

একক ২ ☐ জনসংখ্যার গতিপ্রকৃতি (Population Dynamics)

গঠন (Structure)

২.১ সূচনা

২.২ উদ্দেশ্য

২.৩ জনসংখ্যার গতি প্রকৃতি

২.৩.১ জনসংখ্যার গতি প্রকৃতির সংজ্ঞা

২.৩.২ জনসংখ্যার উপাদান

২.৪ জনবৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য

২.৪.১ জনসংখ্যার আকৃতি

২.৪.২ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার

২.৪.৩ আঞ্চলিক ভিত্তিতে জনসংখ্যা ও বৃদ্ধি

২.৪.৪ জন ঘনত্ব

২.৪.৫ বয়স ও লিঙ্গভিত্তিক গঠন

২.৪.৬ নারী ও পুরুষের অনুপাত

২.৫ জনসংখ্যার পরিবর্তন

২.৫.১ জনসংখ্যা পরিবর্তনের উপাদান

২.৫.২ জনসংখ্যার পরিবর্তনের কারণ

২.৬ জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

২.৬.১ পরিবার পরিকল্পনা

২.৬.২ শিক্ষা

২.৬.৩ প্রজননগত স্বাস্থ্য

২.৬.৪ নারীর ক্ষমতায়ন ও স্বনির্ভরতা

২.৭ সার সংক্ষেপ

২.৮ অনুশীলনী

২.১ সূচনা (Introduction)

জীবনযাত্রার মান সম্বন্ধে আলোচনা করার সময় জনসংখ্যার গতি প্রকৃতির বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছিল। জনবিজ্ঞান (Demography) নামক একটি বিদ্যার প্রধান চর্চার বিষয় জনসংখ্যা সম্বন্ধে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে

বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যাদান ও সমাজ, অর্থনীতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে তার প্রভাব আলোচনা করা। সেই সঙ্গে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার বিজ্ঞানসম্মত বিচার করে দেশের পরিকল্পনা রচনায় সাহায্য করা। জনসংখ্যা কেন বৃদ্ধি পায়, বিভিন্ন দেশে জনসংখ্যার বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে আনুপাতিক অবস্থার কেন পার্থক্য লক্ষ করা যায় এবং তার ফলে কী কী ঘটতে পারে, এই বিষয়টি জনসংখ্যা শিক্ষার অন্যতম আলোচনা বিষয়। কারণ ব্যক্তি ও অন্যান্য জৈবিক, সামাজিক ও ভৌত পরিমণ্ডলের মধ্যে যে সম্পর্ক তার অন্যতম নিয়ন্ত্রণ শক্তি নিহিত আছে জনসংখ্যার গতি প্রকৃতির মধ্যে। এই প্রসঙ্গটিই বর্তমান এককের আলোচ্য বিষয়।

২.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

- জনসংখ্যার গতি প্রকৃতি কাকে বলে বলতে পারবেন।
- জনসংখ্যার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে তথ্য দিতে পারবেন।
- জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে ধারণা দিতে পারবেন।
- প্রজননগত স্বাস্থ্য ও তার গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত হবেন।

২.৩ জনসংখ্যার গতি প্রকৃতি (Population Dynamics)

সূচনাতে জনসংখ্যার গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা দেওয়া হয়েছে। এখানে অন্যান্য আলোচনার পূর্ব এই কথাটির একটি সংজ্ঞা স্থির করা আবশ্যক।

২.৩.১ জনসংখ্যার গতি প্রকৃতির সংজ্ঞা (Definition of Population Dynamics)

স্বতন্ত্র্যভাবে এই কথাটির সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা বিশেষ দেখা যায় না। তবে নানা সূত্র থেকে দেখা যায় যে জনসংখ্যার গতি প্রকৃতি অনুধাবন করার অর্থ জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও বৈশিষ্ট্যের একটি কার্যকারণ ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়াস এবং সেইসঙ্গে জনসংখ্যার নিয়ামক শক্তিগুলি চিহ্নিত করে জনসংখ্যার প্রকৃতিকে বোঝার চেষ্টা করা। বিষয়টি ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। যেমন, আমরা ছোটবেলাতেই শিখেছি যে নদীবিধৌত উর্বর অঞ্চলে জনঘনত্ব সবসময়ই দুর্গম অনুর্বর অঞ্চলের চেয়ে বেশি। কিন্তু বাইরের নিয়ামক শক্তি ছাড়াও জনসংখ্যার গঠন ও বৈশিষ্ট্যের একটি আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি বা নিয়ামক শক্তি আছে। একেই জনসংখ্যার গতি প্রকৃতি হিসাবে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ Population dynamics is the process of population changes due to the forces within population itself (জনসংখ্যার অন্তর্নিহিত শক্তির প্রভাবে জনসংখ্যার পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে বলা যায় জনসংখ্যার গতি প্রকৃতি)।

২.৩.২ জনসংখ্যার উপাদান (Components of Population)

জনবিজ্ঞানে জনসংখ্যা পরিবর্তনের অনেকগুলি উপাদানের কথা বলা হয়।

নারী পুরুষের মোট সংখ্যা (Number of male and female population)

নারী ও পুরুষের অনুপাত (Ratio of male and female population)

জন ঘনত্ব (Population density)

অঞ্চল ভিত্তিক জনসংখ্যার অনুপাত (Proportion of population according to region)

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (Growth rate of population)

বয়সভিত্তিক জনসংখ্যার গঠন (Age structure of population)

বয়সভিত্তিক নারী ও পুরুষের আনুপাতিক গঠন (Age based comparative structure of male and female population) পরবর্তী অংশে এই সাতটি উপাদানের ভিত্তিতে জনসংখ্যার গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হবে।

২.৪ জনবৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য (Demographic Characteristics)

বিশ্বের জনসংখ্যা স্বাভাবিক নিয়মেই ক্রমবর্ধমান। এই পরিবর্তনশীল সংখ্যার হিসাব দেওয়ার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অনুপাতের প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা।

২.৪.১ জনসংখ্যার আকৃতি (Size of the Population)

প্রাচীন ভারতে আর্যসভ্যতার বিকাশের পূর্ব থেকেই ভারতীয় সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল। মনে করা হয় আর্যদের আগমনের এবং আর্য সভ্যতা বিস্তারের পর ভারতে উন্নত নাগরিক জীবন গড়ে উঠেছিল এবং মৃত্যুর হার ছিল কম। তার ফলে গ্রীক ঐতিহাসিক Herodotus (490 B.C.) আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের সময় 34টি শহরে পাঁচ হাজার নাগরিকের বসবাস করার কথা লিখেছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের (321-297 B.C.) সেনাবাহিনী ছিল বিশাল। তার অর্থ সেই সময় থেকে ভারত ছিল জনবহুল দেশ। পণ্ডিতেরা প্রমাণ করেছেন খ্রিস্টপূর্ব 300 বছরের সময় ভারতের জনসংখ্যা দশ থেকে চৌদ্দ কোটির মধ্যে ছিল। Davis যুক্তি সহ দাবি করেন 1600 খ্রিস্টাব্দে ভারতে জনসংখ্যা ছিল সাড়ে বারো কোটি যা দাশগুপ্তর মতে আরও এক কোটি বেশি। 1871 সালে ভারতে প্রথম আদম শুমারি হলে দেখা যায় জন সংখ্যা ২৫.৫ কোটি। ভারতের বর্তমান জনসংখ্যা আনুমানিক একশত চার কোটির মত (2001-এর আদমশুমারি অনুযায়ী 101 কোটি) এর খুঁটিনাটি বিবরণ পাওয়া যাবে জনগণনার দশ বৎসরান্তিক রিপোর্টগুলিতে। কিন্তু প্রকৃত তাৎপর্য জনসংখ্যার আকৃতির চেয়েও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার পর্যালোচনা করলে অনুধাবন করা যাবে।

২.৪.২ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (Growth rate of Population) : 1891 সাল থেকে ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে এর তিনটি পর্যায় আছে। প্রথমটি 1891 থেকে 1921 পর্যন্ত, দ্বিতীয়টি 1921-1951 পর্যন্ত এবং তৃতীয় পর্যায়টি 1951-এর পরবর্তী সময় পর্যন্ত বিস্তৃত।

প্রথম পর্যায়ে বৃদ্ধির হার ছিল খুবই সামান্য। এমনকি প্লেগ, ম্যালেরিয়া, দুর্ভিক্ষ ও অন্যান্য মহামারীর দরুণ 1921 সালের জনগণনায় দেখা যায় 1911 সালে 25.2 কোটির তুলনা হ্রাস পেয়ে 1921 সালে জনসংখ্যা নেমে এসেছে 25.13 কোটিতে। তারপর থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রমশ বাড়তে থাকে। 1921 থেকে 1951 পর্যন্ত বৃদ্ধির হার 1.04 থেকে 1.33 এর মধ্যে। কিন্তু 1951 সালের পর থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অত্যন্ত দ্রুত বাড়তে থাকে। 1981 সালে তা বেড়ে হয় 2.25। স্বাধীনতার পর 1947 সালে জনসংখ্যা আনুমানিক 34.25 কোটি থেকে 1981 সালে তা বেড়ে দ্বিগুণ হয় (68.52 কোটি)। জন সংখ্যা বৃদ্ধির এই হার প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থায় বিগত কুড়ি বছরে জনসংখ্যা আবার প্রায় দ্বিগুণিত হওয়ার মুখোমুখি।

২.৪.৩ আঞ্চলিক ভিত্তিতে জনসংখ্যা ও বৃদ্ধি (Regional Population and its growth)

আমাদের দেশে জন সংখ্যা বৃদ্ধির হার সর্বত্র সমান নয়। ভারতীয় জনগণনায় সমগ্র দেশকে পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়—উত্তর, পূর্ব, মধ্য, পশ্চিম ও দক্ষিণ। এর মধ্যে আয়তনের দিক থেকে মধ্যাঞ্চল সবচেয়ে বড় (737254 বর্গ কিলোমিটার) এবং পশ্চিমাঞ্চল সবচেয়ে ছোট (508050) এর কারণ অবশ্য এই যে পশ্চিমাঞ্চলে গুজরাট ও মহারাষ্ট্রই দুইটি বৃহৎ রাজ্য মাত্র। রাজ্যের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি পূর্বাঞ্চলে (13টি) যাদের মোট আয়তন 688140 বর্গ কিলোমিটার। কিন্তু পূর্বাঞ্চলে জনসংখ্যারও ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি মোট জনসংখ্যার প্রায় 26%। সে তুলনায় উত্তরাঞ্চলে 12%, মধ্যাঞ্চলে 24% পশ্চিমাঞ্চলে 14% এবং দক্ষিণাঞ্চলে 24% জনসংখ্যার বসতি। পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে জনসংখ্যা তুলনামূলক ভাবে অনেক কম। সমতলের কৃষিবহুল অঞ্চলে বসতি সবচেয়ে বেশি। তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বিহার (ঝাড়খণ্ডসহ), উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে খুবই বেশি।

২.৪.৪. জন ঘনত্ব (Density of Population)

মোট জনসংখ্যাকে মোট ভৌগোলিক আয়তন দিয়ে ভাগ করে জন ঘনত্ব নির্ণয় করা হয়। সামগ্রিকভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জন ঘনত্ব ক্রমবর্ধমান এবং সেটাই স্বাভাবিক। কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গ ভারতের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ রাজ্য। সিকিম, মেঘালয়, হিমাচল প্রদেশ, প্রভৃতি রাজ্যগুলির জনঘনত্ব খুবই কম। সবচেয়ে কম আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। এর কারণগুলি ভৌগোলিক অবস্থান ও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি নানা বিষয়ের মধ্যে নিহিত আছে। তার একটি বিষয় হল স্বাধীনতার পর থেকে গ্রামীণ স্বাচ্ছন্দ থেকে নাগরিক স্বাচ্ছন্দ বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ এবং নগরায়ণের দ্রুত প্রসার হওয়ার দরুণ নাগরিক জনঘনত্ব গ্রামের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মধ্যেও বৃহৎ শহরগুলির জনসংখ্যা ও ঘনত্ব ছোট শহরগুলির তুলনায় বেশি।

৪.২.৫ বয়স ও লিঙ্গভিত্তিক গঠন (Age and sexwise Composition)

যদিও সেনসাস প্রতিবেদনে পাঁচ বছর বয়সের ব্যবধানে জনসংখ্যার শতকরা হিসাব তৈরি করা হয়ে থাকে, তবুও তিনটি প্রধান বিভাগ দেশের জনসংখ্যার প্রকৃতি বুঝতে সাহায্য করে। কর্মক্ষম বয়সের কম, কর্মক্ষম বয়স, কর্মক্ষম বয়সের পরবর্তী স্তর, এই তিনটি বিভাগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এখানে কর্মক্ষম বয়স বলতে সাধারণত 15 থেকে 60 বৎসর সীমারেখা ধরা হয়। কিন্তু এই বিষয়টি কিছুটা অস্পষ্ট ও পরিবর্তনশীল। মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি, জীবন প্রত্যাশা (Life expectancy) বৃদ্ধি, উন্নত স্বাস্থ্য পরিসেবা, পুষ্টি ইত্যাদি অর্থাৎ এক কথায় জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের সঙ্গে কর্মক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। স্বাধীন পেশার ক্ষেত্রেও কর্মক্ষমতার কোন বয়স ভিত্তিক সীমারেখা

টানা যায় না। বিষয়টির গুরুত্ব এখানেই যে কর্মক্ষমতার সঙ্গে জীবনযাত্রার মান ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে অবসর গ্রহণের বয়স বাড়িয়ে দিয়ে কর্মক্ষমতার এই ঊর্ধগতিকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন।

যাইহোক অন্যান্য দেশের মত ভারতেও 14 বছর বয়স পর্যন্ত জনসংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি (প্রায় 39-40%)। এর তাৎপর্য এই যে জন্মহার, এখনও যথেষ্ট বেশি এবং শিশু মৃত্যুর হারও বেশি। এর ফলে সমস্ত শিশু কর্মক্ষম বয়সে পৌঁছাতে পারে না। যাটোর্ধ্ব বয়স্ক ব্যক্তিদের সংখ্যা প্রায় 7% এবং মধ্যবর্তী অংশের সংখ্যা 53-54%। এই অনুপাত পুরুষ ও নারীর ক্ষেত্রে সামান্য পরিমাণে ভিন্ন। বলা বাহুল্য এই অনুপাত ক্রমাগত পরিবর্তনশীল। বয়স্ক নাগরিকের সংখ্যা আনুপাতিক হারে ক্রমবর্ধমান যা উন্নত জীবনযাপনের অন্যতম সূচক। কারণ স্বাস্থ্য, পুষ্টি, মৃত্যুহার কমে যাওয়া, অবসর জীবনের সুরক্ষা ও নিশ্চিত ব্যবস্থা এসবই জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের অঙ্গ এবং এর ফলেই কোন সমাজে মানুষ দীর্ঘজীবন লাভ করতে পারে।

২.৪.৬. নারী ও পুরুষের অনুপাত (Proportion of male and female Population)

ভারতের অন্যতম প্রধান সমস্যা নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি এবং পুরুষ সন্তানকে সম্পদ হিসাবে বিবেচনা করে স্ত্রী সন্তানকে অবাঞ্ছিত আপদ মনে করা। এর প্রতিফলন দেখা যায় জনসংখ্যার নারী ও পুরুষের আনুপাতিক অবস্থানে। একমাত্র কেরল ছাড়া ভারতের সমস্ত রাজ্যে প্রতি এক হাজার পুরুষ পিছু নারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কম। অধিকাংশ উন্নত সমাজে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা বেশি। কারণ শিশু মৃত্যুর হার খুব কম হওয়ায় এবং ছেলে ও মেয়ে সমানভাবে লালিত হওয়ায় স্বাভাবিক নিয়মেই নারীর সংখ্যা বেশি হয়ে থাকে। অন্ততঃপক্ষে সমান সমান থাকে।

আমাদের দেশে মেয়েদের সম্বন্ধে নেতিবাচক মনোভাব খুব ব্যাপক। তারজন্য কন্যা ভ্রূণ হত্যার অসংখ্য ঘটনা এখনও ঘটে চলেছে। সদ্যোজাত কন্যা সন্তান হত্যা ও পরিত্যাগ করার ঘটনাও বিরল নয়। জনসংখ্যা শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্য দূর করে উভয়ের প্রতি ইতিবাচক প্রতিন্যাস গঠন। এই দিক থেকে বিচার করলে বলা যায় ভারতীয় জীবনযাত্রার মান এখনও যথেষ্ট উন্নত নয়। বহু সামাজিক কুপ্রথা, কুসংস্কার এখনও দূর না হওয়াই এই ধরনের বৈষম্যের প্রধান কারণ।

উপরোক্ত আলোচনায় পরিসংখ্যান অপেক্ষা বিষয়বস্তুর উপর জোর দেওয়া হয়েছে বেশি কারণ পরিসংখ্যান সদা পরিবর্তনশীল। তাছাড়াও জনবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ পদ্ধতি জনসংখ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। সে জন্য জনবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলিই এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরা হল।

২.৫ জনসংখ্যার পরিবর্তন (Changes in Population)

একথা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না যে জনসংখ্যা বৈশিষ্ট্যগুলি সদা পরিবর্তনশীল। কিন্তু এই পরিবর্তন একমুখী নয়, বহুমুখী। শুধু মাত্র সংখ্যাবৃদ্ধি নয় তার পাশাপাশি নানা আনুপাতিক পরিবর্তনও ক্রমাগত ঘটে চলেছে। প্রশ্ন হল, এই পরিবর্তন কেন ঘটে? জনসংখ্যার পরিবর্তনের পিছনে উন্নয়নের যেমন পরোক্ষ ভূমিকা থাকে তেমনি কিছু কিছু প্রত্যক্ষ কারণে পরিবর্তন হয়। তার পূর্বে জনসংখ্যা পরিবর্তনের উপাদানগুলি উল্লেখ করা প্রয়োজন।

২.৫.১. জনসংখ্যা পরিবর্তনের উপাদান (Components of Population Change)

যে সমস্ত উপাদান জনসংখ্যার পরিবর্তনের সঙ্গে জড়িত তার কয়েকটি নিচে উল্লেখ করা হল,

প্রজনন ক্ষমতা (Fertility) : সন্তান ধারণের ক্ষমতাকে বলা হয় প্রজনন ক্ষমতা। কখনও কখনও **গর্ভধারণ ক্ষমতা (Natality)** শব্দটিও ব্যবহার করা হয়। বলাবাহুল্য শব্দটি নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যৌবনাগমের সঙ্গে সঙ্গে মুখ্য ও গৌণ যৌনাঙ্গের পরিনমণ, হরমোনের সক্রিয়তা প্রজনন ক্ষমতার সূত্রপাত ঘটায়। পুরুষের প্রজনন ক্ষমতাও একইভাবে জন্মায় তবে সাধারণত মেয়েদের চেয়ে দুই বৎসর পরে। নারীর প্রজনন ক্ষমতার সময় সীমা খুব স্পষ্ট ও প্রায় আকস্মিকভাবে তা বন্ধ হয়ে যায়। অপরপক্ষে পুরুষের প্রজনন ক্ষমতা দীর্ঘকাল ধরে একটু একটু করে কমতে থাকে।

এছাড়াও প্রজনন সক্ষমতা (Facundity) ও প্রজনন ক্ষমতার মধ্যে অনেক সময় পার্থক্য করা হয়। প্রথমটি হল নারী জীবিত সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা আর দ্বিতীয়টির অর্থ প্রকৃত জন্মদানের ক্ষমতা। প্রজনন ক্ষমতার সঙ্গে পরিবারের আকৃতি (Family size), জন্মক্রম (Birth Order) এবং বন্ধ্যাত্ব (Infertility) এই শব্দগুলিও যুক্ত। পরিবারের গঠনের ক্ষেত্রে জন্মক্রমের গুরুত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অর্থাৎ পরপর সন্তানের মধ্যে বয়সের পার্থক্য, লিঙ্গের পার্থক্য ইত্যাদি বিষয়গুলি পরিবারের সন্তানদের প্রতিপালনের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব ফেলে। যেমন, প্রথম সন্তান মেয়ে হলে তার উপর সাংসারিক দায়িত্ব ছোটবেলা থেকেই বেশি পড়ে (বিশেষ আর্থ সামাজিক অবস্থায়), তার শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অবহেলিত হয়।

প্রজনন ক্ষমতার বিশ্লেষণ করার জন্য (Fertility analysis) কয়েকটি বিশেষ পরিভাষা ব্যবহার করা হয়।

স্থূল জন্মহার (Crude Birth Rate) : কোন ভৌগোলিক অঞ্চলে এক বছরে যত জীবিত শিশু জন্মগ্রহণ করে তার সংখ্যাকে বছরের মাঝামাঝি যে মোট জন সংখ্যা ছিল সেই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে 1000 দিয়ে গুণ করে স্থূল জন্মহার নির্ণয় করা হয়।

সাধারণ প্রজনন হার (General Fertility Rate) : কোন ভৌগোলিক অঞ্চলে এক বছরে যত জীবিত শিশু জন্মায় তার সংখ্যাকে 15-44 বৎসর বয়সী যত নারী (বছরের মাঝামাঝি) আছে তার সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে 1000 দিয়ে গুণ করে সাধারণ প্রজনন হার নির্ণয় করা হয়।

বয়স বিশেষের প্রজনন হার (Age Specific Fertility Rate) : সাধারণ প্রজনন হারের মত একই। শুধু ছোট ছোট বয়ঃসীমার জন্য (যেমন, 15-19, 20-24 ইত্যাদি) আলাদা করে প্রজনন হার নির্ণয় করা হয়।

মোট প্রজনন হার (Total Fertility Rate) : পূর্বোক্ত বয়সভিত্তিক প্রজনন হারগুলির যোগফলকে নারীর প্রতি হার হিসাবে প্রকাশ করার পদ্ধতি। অর্থাৎ যদি বয়ঃসীমা 5 বছর হয় তবে 5 দিয়ে যোগফলকে গুণ করে মোট প্রজনন হার নির্ণয় করা হয়।

উপরোক্ত পরিমাপগুলির সাহায্যে আরও কিছু সূচক ব্যবহার করে জনসংখ্যা ও প্রজনন বিষয়ক বিশ্লেষণ করা হয়। অঞ্চল ভিত্তিতে সূচকগুলি আলাদা এবং প্রজনন হারের সঙ্গে আর্থ সামাজিক প্রসঙ্গ খুবই জরুরি।

প্রজনন ও আর্থ সামাজিক প্রসঙ্গ (Fertility and Socio-economic Relevance) : এখানে পাঁচটি সম্পর্কিত বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন।

শিক্ষা ও প্রজনন ক্ষমতা (Education and Fertility) : শিক্ষার সঙ্গে প্রজনন ক্ষমতার বিপরীত সম্পর্ক।

উচ্চশিক্ষিত জনগণের ক্ষেত্রে প্রজনন কম। কারণ শিক্ষা উন্নত জীবনযাপনের প্রেরণা দেয়। শিক্ষার জন্য দীর্ঘকাল ও অনেকটা প্রয়াস ব্যয় হয় এবং বিবাহের বয়স পিছিয়ে যায়।

আয় ও প্রজনন ক্ষমতা (Income and Fertility) : মাথাপিছু আয় বেশি হওয়ার অর্থ পরিবারের আকৃতি সীমিত রেখে মাথাপিছু অধিক আর্থিক স্বাচ্ছন্দের নিশ্চিত ব্যবস্থা। সন্তানের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার কথা ভেবেও উচ্চ আয়ের মানুষ পরিবার সীমিত রাখেন।

পেশা ও প্রজনন (Occupation and Fertility) : উচ্চবৃত্তি অবলম্বনকারী পরিবারের সন্তান সংখ্যা সীমিত থাকে। এদের বৃত্তির প্রয়োজনে জীবনযাত্রার মান উন্নত রাখতে হয়, বিনোদনের অনেক সুযোগ থাকে এবং সামাজিক মর্যাদা রক্ষার জন্য পরিবারের আকৃতি সীমিত রাখতে হয়।

বিবাহের বয়স ও প্রজনন (Age of Marriage and Fertility) : বাল্যবিবাহ বহু শিশুর জন্ম ও উচ্চহারে শিশু মৃত্যুর অন্যতম কারণ। সেজন্য দেরীতে বা উপযুক্ত বয়সে বিবাহ হলে পরিবারের আকৃতি সীমিত থাকে। অভিজ্ঞতার দরুণ শিশুর মৃত্যুর সম্ভাবনাও কমে। সম্প্রতি ভারতে বাল্য বিবাহকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রবল চেষ্টা রাষ্ট্রীয় স্তরে লক্ষ করা যাচ্ছে যা প্রজনন সংক্রান্ত অজস্র সমস্যা সৃষ্টি করবে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

সামাজিক আন্দোলন ও প্রজনন (Social Movement and Fertility) : বিভিন্ন ধরনের সামাজিক আন্দোলন প্রত্যক্ষভাবে প্রজননের হার কমায়। যেমন, সাক্ষরতা আন্দোলন, শিশুশ্রম বিরোধী আন্দোলন, বাল্যবিবাহ নিরোধ আন্দোলন ইত্যাদি।

মরণশীলতা (Mortality) : শুধুমাত্র জন্ম হার নয় পাশাপাশি মৃত্যুর প্রসঙ্গটিও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মরণশীলতার অনেকগুলি পর্যায় আছে। যেমন,

ভ্রূণ অবস্থায় মৃত্যু (Foetal death) : জন্মের পূর্বে গর্ভকাল সম্পূর্ণ করার পূর্বেই মৃত্যু। এর মধ্যে আছে মৃতসন্তানের জন্মদান (Still birth), গর্ভস্রাব (Micarriage) এবং গর্ভপাত (Abortion)।

সদ্যোজাত অবস্থায় মৃত্যু (Neonatal death) : সাধারণত umbilical cord ছিন্ন করার আগেই অথবা জন্মের কয়েক ঘন্টার মধ্যেই মৃত্যু। কখনও দুই সপ্তাহের মধ্যে মৃত্যু হলেও তাকে সদ্যোজাত অবস্থায় মৃত্যু বলা হয়।

শিশু মৃত্যু (Infant death) : সাধারণত পাঁচ বছর বয়সের মধ্যে মৃত্যু। তবে এই বয়ঃসীমার কোন স্থিরতা নেই। ভারতে কন্যা ভ্রূণ হত্যা (Abortion of female foetus), সদ্যোজাত অবস্থায় মৃত্যু ও শিশুর মৃত্যুর হার খুবই বেশি।

মরণশীলতার জন্য কয়েকটি সূচক ব্যবহার করা হয়।

স্থূল মৃত্যু হার (Crude Death Rate) : কোন ভৌগোলিক অঞ্চলে বাৎসরিক মৃত্যুর সংখ্যা ও জনসংখ্যার অনুপাতকে 1000 দিয়ে গুণ করে স্থূল মৃত্যু হার নির্ণয় করা হয়।

বয়সভিত্তিক মৃত্যু হার (Age Specific Death Rate) : কোন বয়স সীমার মৃত্যু হার। পদ্ধতি স্থূল মৃত্যু হার নির্ণয়ের অনুরূপ। শুধু নির্দিষ্ট বয়সের মধ্যে সমস্ত গণনা সীমাবদ্ধ রাখা হয়।

বয়সভিত্তিক মরণশীলতার হার (Age Specific Mortality Rate) : কোন বয়সে মৃত্যুর সম্ভাবনা কতটা।

জন্মের সময় জীবনের প্রত্যাশা (Expectation of life at Birth) : গড়পরতা একটি শিশু কত বছর বয়স পর্যন্ত বাঁচতে পারে। বর্তমানে আমাদের দেশে জীবনের প্রত্যাশা অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্থানান্তর গমন (Migration) : কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যে অঞ্চলে সাধারণত স্থায়ীভাবে বসবাস করে জীবিকা বা অন্যকোন কারণে সে বা তারা যদি অন্যত্র সাময়িকভাবে অথবা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালের জন্য বসবাস করতে থাকে তবে তাকে বলা হয় স্থানান্তর গমন। যদি এক দেশের মানুষ অন্যদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে যায় তবে তাকে বলা হয় অভিবাসন (Immigration)। আবার কখনও আইন সঙ্গতভাবে বসবাস না করে বিনা অনুমতিতে অন্যদেশে বসবাস করার নাম অনুপ্রবেশ (Infiltration)। এই তিন প্রকার স্থানান্তর গমন জনসংখ্যার প্রকৃতি পরিবর্তনের অন্যতম উপাদান। জন বিজ্ঞানের এই তিন প্রকার স্থানান্তর গমনকে বলা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক স্থানান্তর গমন (International Migration) : আইনানুগ পথে এক দেশ থেকে অন্যদেশে স্থায়ীভাবে সপরিবারে বসবাস।

আভ্যন্তরীণ স্থানান্তর গমন (Internal Migration) : নিজের দেশেই এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে, এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করা। ভারতীয় সংবিধানে বিষয়টি মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত।

স্থানীয় চলাচল (Local movement) : মূলত জীবিকার প্রয়োজনে অল্পকালের জন্য একস্থান থেকে অন্যস্থানে অস্থায়ীভাবে বসবাস করা। যেমন, ফসল বোনা বা কাটার জন্য দলে দলে শ্রমিকদের পশ্চিমবঙ্গে আসা।

এরমধ্যে স্থানীয় চলাচলের জন্য জনসংখ্যার গঠনে খুব একটা পরিবর্তন হয় না। কিন্তু অন্য দুই প্রকার স্থানান্তর গমন জনসংখ্যার প্রকৃতি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। স্থানান্তর গমন সংক্রান্ত বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াও যথেষ্ট জটিল এবং বর্তমান পাঠের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়। শুধু মনে রাখতে হবে পার্শ্ববর্তী দেশের জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যদি কোন মৌলিক ভেদ না থাকে তবে স্থানান্তর গমন সকলের অজ্ঞাতেই কোন দেশের জন গোষ্ঠীর প্রকৃতিতে পবিরর্তন আনতে পারে। ভারতে অভিবাসনের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান প্রভৃতি দেশ থেকে। এই সব দেশের সঙ্গে রাজনৈতিক মৈত্রীই এর কারণ। পশ্চিমাঞ্চলে অভিবাসন সেদিক থেকে কিছুটা কঠিন।

২.৫.২. জনসংখ্যা পরিবর্তনের কারণ (Causes of Population Change)

একথা ইতিমধ্যেই পরিস্কার যে জনসংখ্যা পরিবর্তনের উপাদানগুলির মধ্যেই পরিবর্তনের কারণগুলি নিহিত আছে। প্রজনন তথা জন্ম হার, মৃত্যুর হার, স্থানান্তর গমন জনসংখ্যার প্রকৃতিতে পরিবর্তন আনে। এছাড়াও প্রত্যক্ষভাবে কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা দরকার।

আঞ্চলিক বিকাশ (Regional Development) : দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বিকাশের মধ্যে অসাম্য থাকলে একদিকে যেমন, উপরোক্ত তিনটি উপাদানের ক্ষেত্রে পার্থক্য সৃষ্টি হয়, তেমনি অনুন্নত এলাকা থেকে উন্নত এলাকায় যেয়ে বসবাস করার প্রবণতা বাড়ে। এই কথাটি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

আবহাওয়া (Climate) : প্রতিকূল আবহাওয়া, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনাপূর্ণ স্থান (যেমন, বন্যাপ্রবণ বা নদীর ভাঙ্গন প্রবণ এলাকা অনেকের কাছে বসবাসের পক্ষে অনুপযোগী মনে হতে পারে। কিন্তু তাছাড়াও এই সব অঞ্চলে মৃত্যুহার অপেক্ষাকৃত বেশিও হতে পারে।

পেশা (Occupation) : নিজের পেশার উপযোগী কাজ না থাকলে স্থানান্তর গমনের প্রবণতা বাড়ে। অথবা অধিক স্বচ্ছলতার আশাতেও স্থানান্তর গমনের প্রবণতা বাড়ে।

সামাজিক নিরাপত্তা (Social Security) : সামাজিক নিরাপত্তার অভাব স্থানান্তরগমনের প্রবণতা বাড়ায়, এবং স্বাভাবিকভাবেই জনসংখ্যার প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়।

অন্যান্য কারণগুলি জন্ম ও মৃত্যু সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

২.৬ জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (Population Control Measures)

জীবনযাত্রার মানোন্নয়নই প্রধান নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। কিন্তু এছাড়াও নানাভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা হয়ে থাকে। তার মধ্যে সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা ছিল পরিবার পরিকল্পনা।

২.৬.১. পরিবার পরিকল্পনা (Family Planning) :

দীর্ঘকাল যাবৎ পরিবার পরিকল্পনাই ছিল একমাত্র জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি। পরিবার পরিকল্পনার অর্থ ইচ্ছামত বা পূর্ব পরিকল্পনা মত সন্তান ধারণ ও পরিবারের আকৃতি সীমিত রাখার প্রয়াস। নির্দিষ্টভাবে বলা যায়।

দুটি সন্তানের বেশি সন্তান না হওয়ার পরিকল্পনা।

প্রথম সন্তানের জন্ম একটু দেরিতে।

দ্বিতীয় সন্তান আরও চার পাঁচ বছর পরে।

পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতি হিসাবে যে পদক্ষেপগুলি নেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে আছে,

প্রচার (Publicity) : বিজ্ঞাপন, রেডিও, হোর্ডিং, পোস্টার ইত্যাদির মাধ্যমে 'ছোট পরিবার, সুখী পরিবার', জাতীয় স্লোগান প্রচার করা। ছোট পরিবারের সুফল সম্বন্ধে আলোচনা, প্রচার ও জনমত তৈরি করার প্রয়াস দীর্ঘকাল ধরে নেওয়া হয়েছে এবং প্রতিটি সরকারই তার জন্য অর্থ ব্যয় করেছে। প্রচারের সুফল কিছুটা পাওয়া গেলেও সর্বত্র তা সমানভাবে কার্যকর হয়নি।

জন্ম শাসন (Birth Control) : ঔষধ ও নানা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে (যেমন, কন্ডোম, কপার-T ইত্যাদি ব্যবহার) জন্মশাসন করার চেষ্টা। বিনামূল্যে কণ্ডোম বিতরণ ও তার ব্যবহারের স্বপক্ষে প্রচার করায় কিছুটা সুফল পাওয়া গেলেও তা সর্বত্র সমান জনপ্রিয় হয়নি। ঔষধ প্রয়োগ খুবই কার্যকর পদ্ধতি হলেও, ঔষধ ব্যয় সাপেক্ষ হওয়াতে তা দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে আয়ত্তাধীন ছিল না।

শল্য চিকিৎসা (Operation) : দুটি সন্তান জন্মের পর নারীদেহের ফ্যালোপিয়ান টিউবে অপারেশন করে ডিম্ব নিঃসরণের পথ বন্ধ করার পদ্ধতি জন্ম নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি হিসাবে খুবই নিশ্চিত পদ্ধতি। সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে এই অপারেশনের সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু অমূলক ভয়, কুসংস্কার দুটি সন্তানেরই মৃত্যুর আশঙ্কা ইত্যাদি কারণে অনেকেই অপারেশন করাতে অনীহা প্রকাশ করে। পুরুষ বন্ধ্যাত্ব ভ্যাসেক্টমি যা যৌন ক্ষমতা বজায় রেখেও শুক্র নিঃসরণের পথ বন্ধ করে দেয়, একই কারণে সবচেয়ে কম জনপ্রিয় হয়েছিল। সবচেয়ে বড় কারণ একবার অপারেশনের পর আর সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা ফিরে পাওয়া যায় না।

২.৬.২. শিক্ষা (Education)

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার শিক্ষার বিস্তার। স্বাধীনতার পর থেকে বিগত ষাট বছরে শিক্ষার

প্রভূত বিস্তার হলেও এখনও বিপুল সংখ্যক নারী ও পুরুষ নিরক্ষর রয়ে গেছে। শিক্ষা নানাভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে।

- শিক্ষা মানুষের রুচি, উন্নত জীবন যাপনের প্রতি আগ্রহ বাড়ায়।
- শিক্ষা সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটায়।
- শিক্ষার ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুস্থ মনোভাব গড়ে তোলে পরস্পরের প্রতি আস্থা বাড়ায় এবং সম্পর্ক দৃঢ় করে।
- সন্তান পালনের যৌথ দায়িত্ব শিক্ষার ফলেই সম্ভব।
- শিক্ষা উপার্জনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং তার সদ্ব্যয় করার মানসিকতা তৈরি করে।
- শিক্ষা মানুষকে যুক্তি পরায়ণ, তথ্য নির্ভর করে তোলে। ফলে তার পক্ষে পরিপার্শ্বিক সবকিছুকে বিচার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়।
- শিক্ষা মানুষকে সুস্থ অবসর যাপন ও বিনোদনে অনুপ্রাণিত করে।

এই সব কিছুই পরিবার সীমিত রাখার পক্ষে সহায়ক।

২.৬.৩. প্রজননগত স্বাস্থ্য (Reproductive Health)

প্রজননগত স্বাস্থ্য মূলত দুটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। প্রথমত, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুস্থ যৌন জীবন যাপন এবং দ্বিতীয়ত যৌনতাবাহিত রোগ সম্বন্ধে সচেতন থেকে সেগুলি এড়িয়ে যাওয়া।

সুস্থ যৌন জীবন যাপনের প্রাথমিক শর্ত প্রজনন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রাথমিক কিন্তু সম্পূর্ণ জ্ঞান। এজন্য প্রত্যেক দম্পতিরই উচিত যৌনাঙ্গ ও প্রজনন সম্বন্ধে সঠিক তথ্য জেনে নেওয়া। প্রয়োজনবোধে কোন বিশেষজ্ঞের কাছে যৌথভাবে শিখে নেওয়া। দ্বিতীয় শর্ত, যৌন জীবন যাপনের জন্য সুস্থ মানসিকতা এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া। এই বিষয়টি পরস্পরকে জানা ও বোঝার চেষ্টার মধ্যে দিয়ে তৈরি হয় যা প্রত্যেক দম্পতিরই অবশ্য কর্তব্য। তৃতীয় শর্ত, পরিচ্ছন্নতা। যৌন জীবনে পরিচ্ছন্নতা বহু ব্যাধি, সংক্রমণ ও সমস্যার সম্ভাবনা দূর করে দেয়। সুস্থ যৌন জীবনের চতুর্থ শর্ত বিশ্বস্ততা। বিশ্বস্ততার সঙ্গে যুক্ত আছে যৌনতা বাহিত মারণ ব্যাধিগুলির বিস্তার। AIDS (Acquired Immuns Deficiency Syndrome) যা HIV নামক Virus রক্ত অথবা যৌনাঙ্গের মাধ্যমে দেহে সঞ্চালিত হয়ে সৃষ্টি হয়, এমনই একটি মারণ ব্যাধি।

AIDS সম্বন্ধে বর্তমানে সমস্ত শিক্ষিত মানুষেরই প্রাথমিক জ্ঞান আছে একথাও বহুবিদিত যে বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী বর্তমানে HIV বাহক। তারা যে কোন সময়ই AIDS আক্রান্ত হতে পারে। নিজেদের অজ্ঞাতে অন্যের দেহে HIV সংক্রামিত করতে পারে। জনসংখ্যা শিক্ষা বিদ্যালয় পর্যায় থেকেই এই বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা দিয়ে শিক্ষার্থীদের সুস্থ যৌন জীবনযাপনের প্রয়োজনীয়তা ও বিশ্বস্ততার মানসিকতা তৈরি করায় সাহায্য করতে পারে।

AIDS ছাড়াও আরও দুটি জীবাণু ঘটিত যৌনতা বাহিত ব্যাধি প্রজননগত স্বাস্থ্যের বিপুল ক্ষতি করতে পারে। এগুলি হল Syphilis (সিফিলিস) ও Gonoria (গনোরিয়া)। কিন্তু বিশ্বস্ত দাম্পত্য জীবন ও প্রাক্‌বিবাহকালীন সুস্থজীবন যাপন সহজেই এই জাতীয় ব্যাধিকে দূরে রাখতে পারে। সিফিলিস রোগে অনেক সময়ই দীর্ঘকাল ধরে কোন রোগলক্ষণ প্রকাশ পায় না। ধীর ধীরে Treponema Pallidum নামক জীবাণু, যা সিফিলিসের কারণ, যৌনাঙ্গ ও সন্নিহিত অঞ্চলে ক্ষত সৃষ্টি করে। কিন্তু তা স্থায়ী হয় না। এর পর দেহসন্ধিতে ব্যথা, চুলপড়া, হাতে

বা পায়ে কড়া পরা এইসব লক্ষণ দেখা দেয়। চূড়ান্ত পর্যায়ে রক্তবাহিত হয়ে মস্তিষ্ক ও হৃদযন্ত্র আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর কারণ হয়। প্রথমদিকে ধরা না পড়লে সিফিলিস দুরারোগ্য ব্যধির সৃষ্টি করে। সে দিক থেকে গনোরিয়া থেকেও সিফিলিস বিপজ্জনক। আর একটি সম্ভাবনা হল সিফিলিস। শিশু জন্মের সময়, নবজাতককে সংক্রামিত করতে পারে। তার ফলে অন্ধত্ব ও অন্যান্য সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়। প্রজননগত স্বাস্থ্য ঠিক থাকলে সুস্থ ও স্বাভাবিক সন্তানের জন্ম হয়, তার মরণশীলতা কমে। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই জন্মহার কম হয় এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হয়।

২.৬.৪. নারীর ক্ষমতায়ন ও স্বনির্ভরতা (Women empowerment and Self reliance)

যে সমাজে নারীরা যত অসহায়, সেই সমাজে জন্মহারও বেশি। নারী পুরুষের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল অবস্থায় তার ইচ্ছা অনুযায়ী সন্তান ধারণে বাধ্য হয়। কখনও কখনও চূড়ান্ত শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য বা স্বাস্থ্যহীনতা সত্ত্বেও তার পক্ষে এছাড়া কোন উপায় থাকে না। ভারতে এই একটিমাত্র কারণেই জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ এখনও আশানুরূপ নয়। এই জন্য নানাভাবে আইনি পথে এবং সামাজিক আন্দোলনের পথে নারীকে কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা ও ক্ষমতা এমনভাবে দেওয়া হচ্ছে যে তারা কিছু স্বাধীনভাবে নিজেদের সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কিন্তু নির্ভরতা না কমলে, শুধুমাত্র সুযোগ থাকলেই সাধারণ মানুষ এর সুযাগ নিতে পারে না। অশিক্ষা, অজ্ঞতাও এর অন্যতম কারণ। সেজন্য গ্রাম ও শহরের মেয়েদের স্বনির্ভর করে তোলার একটি প্রক্রিয়া এখন সর্বত্র চলেছে। বাংলাদেশে মহম্মদ ইউনিস এ ব্যাপারে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরাতে তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে স্বনির্ভরতা প্রকল্পগুলি সফলভাবে কাজ করে চলেছে। এর ফলে যে পরিবর্তনগুলি ঘটছে তা হল—

- পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা ও জীবনের মানোন্নয়ন,
- শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ও অনুরাগ বিস্তৃত হওয়া,
- উপার্জনশীল স্ত্রীর প্রতি পুরুষের কিছুটা শ্রদ্ধা তৈরি হওয়া,
- কাজে নিয়োজিত থাকার জন্য কিছুটা সমানাধিকার,
- স্বাধীনতাবোধ। পুরুষের ইচ্ছায় তার শয্যা সঙ্গিনী না হওয়া,
- শিশুদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দেওয়া,
- বিনোদনের সুস্থ উপায়গুলি কাজে লাগানো,
- ভবিষ্যতের নিরাপত্তার জন্য কিছুটা সঞ্চয় প্রবণতা, এবং
- অতি অবশ্যই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ।

২.৭ সারসংক্ষেপ (Summary)

জনসংখ্যার গতি প্রকৃতি বলতে বোঝায়, জনসংখ্যার অন্তর্নিহিত শক্তির প্রভাবে জনসংখ্যার পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে। জনসংখ্যার যে উপাদানগুলি জনবিজ্ঞানে চর্চা করা হয় তার মধ্যে আছে, নারী-পুরুষের মোট সংখ্যা, নারী ও পুরুষের অনুপাত, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, বয়সভিত্তিক জনসংখ্যার গঠন, অঞ্চলভিত্তিক জনসংখ্যার

অনুপাত, জনঘনত্ব, বয়সভিত্তিক নারী ও পুরুষের আনুপাতিক গঠন। ভারতে মোট জনসংখ্যা বর্তমানে ১০৪ কোটিরও বেশি। সংখ্যা বৃদ্ধির হার বিশ্বের অন্যতম সর্বোচ্চ। নানা কারণে কেরল ও পশ্চিমবঙ্গে জনঘনত্ব সবচেয়ে বেশি। একমাত্র কেরলে নারীর সংখ্যা আনুপাতিক হারে পুরুষের চেয়ে বেশি। অন্যত্র শুধুমাত্র কম নয়, বিপজ্জনক ভাবে কম। অশিক্ষা, কুসংস্কার, সামাজিক কুপ্রথা এর জন্য দায়ী। কন্যা ভ্রূণ হত্যা এখনও ব্যাপক।

জনসংখ্যা সর্বদা পরিবর্তনশীল। জনসংখ্যা পরিবর্তনের উপাদানগুলির পরিবর্তন হলে জনসংখ্যার পরিবর্তন হয়। প্রজনন ক্ষমতা, প্রজনন সক্ষমতা, স্থূল জন্ম হার, বয়স বিশেষের প্রজনন হার ও মোট প্রজনন হার এইগুলি প্রজনন সংক্রান্ত উপাদান। প্রজনন সংক্রান্ত উপাদানগুলি নির্ভর করে আর্থ সামাজিক বিষয়ের উপর। শিক্ষা, আয়, পেশা, বিবাহের বয়স, সামাজিক আন্দোলন ইত্যাদি প্রজননকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। জনসংখ্যা পরিবর্তনের আর একটি উপাদান, মরণশীলতা। মৃত্যুর নানা স্তর আছে, যেমন, ভ্রূণ অবস্থায় মৃত্যু (মৃত সন্তানের জন্মদান, গর্ভস্রাব, এবং গর্ভপাত), সদ্যোজাত অবস্থায় মৃত্যু, শিশু মৃত্যু এবং স্বাভাবিক পরবর্তী সময়ের মৃত্যু। মরণশীলতার সূচকগুলি হল, স্থূল মৃত্যু হার, বয়সভিত্তিক মৃত্যুহার, বয়সভিত্তিক মরণশীলতার হার এবং জন্মের সময় জীবনের প্রত্যাশা।

জনসংখ্যা পরিবর্তনের আর একটি সূচক স্থানান্তর গমন। জনবিজ্ঞানে তিন প্রকার স্থানান্তর গমনের কথা বলা হয়। যথা, আন্তর্জাতিক স্থানান্তর গমন, স্থানীয় চলাচল এবং আভ্যন্তরীণ স্থানান্তর গমন। এই সব উপাদানগুলির পরিবর্তন হলে যেমন জনসংখ্যার পরিবর্তন হয়, তেমনি আরও কয়েকটি প্রত্যক্ষ কারণে জনসংখ্যা পরিবর্তিত হয়, যেমন, আঞ্চলিক বিকাশ, আবহাওয়া, পেশা, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি।

জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মধ্যে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ছাড়াও প্রধান ও প্রথম পদ্ধতি ছিল, পরিবার পরিকল্পনা। পরিবার সীমিত রাখার উদ্দেশ্যে প্রচার, জন্মশাসনের নানা পদ্ধতি, শল্যচিকিৎসা, প্রভৃতি নানা উপায়ে পরিবার পরিকল্পনা কার্যকর করার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু তা সর্বাংশে কার্যকর করা হয়নি। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে ভালো উপায় শিক্ষা ও মেয়েদের স্বনির্ভরতা। এছাড়াও প্রজননগত স্বাস্থ্য রক্ষা করা হলে সুস্থ ও স্বাভাবিক সন্তানের জন্ম হয়, তার মরণশীলতা কমে এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হয়।

২.৮ অনুশীলনী

1. অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Very Short Answer Questions)

(ক) জনসংখ্যার গতি প্রকৃতি বলতে কী বোঝায়?

(খ) জনসংখ্যার আকৃতি কাকে বলে?

(গ) আঞ্চলিক ভিত্তিতে জনসংখ্যার বৃদ্ধির তাৎপর্য কী?

(ঘ) জন ঘনত্ব কোন কোন অঞ্চলে বেশি?

(ঙ) ভারতে পুরুষের অনুপাতে নারীর সংখ্যা কম কেন?

(চ) প্রজনন ক্ষমতা কাকে বলে?

(ছ) প্রজনন সক্ষমতা কাকে বলে?

(জ) স্থূল প্রজনন হার কাকে বলে?

(ঝ) বিবাহের বয়স ও প্রজনন ক্ষমতার সম্পর্ক কী?

(ঞ) মরণশীলতা কাকে বলে?

(ট) ভ্রূণ অবস্থায় মৃত্যু কথাটির অর্থ কী?

(ঠ) আন্তর্জাতিক স্থানান্তর গমন কাকে বলে?

(ড) সিফিলিস কোন জীবাণুদ্বারা সংক্রামিত হয়?

2. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Short Answer Questions)

(ক) নারী ও পুরুষের অনুপাত উল্লেখ করে এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

(খ) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখুন।

(গ) জনঘনত্বের পার্থক্য কেন হয়?

(ঘ) প্রজনন ক্ষমতা ও প্রজনন সক্ষমতার পার্থক্য কি? জনসংখ্যার সঙ্গে এদের সম্পর্ক কী?

(ঙ) প্রজনন ক্ষমতার সঙ্গে আর্থসামাজিক বিষয়গুলির সম্পর্ক উল্লেখ করুন।

(চ) মরণশীলতা কাকে বলে? মৃত্যুহার কোন কোন সূচক দ্বারা মাপা হয়?

(ছ) স্থানান্তর গমন কেন হয়?

(জ) জনসংখ্যা পরিবর্তনের কয়েকটি কারণ উল্লেখ করুন।

(ঝ) প্রজননগত স্বাস্থ্য কি? এর সঙ্গে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সম্পর্ক কী?

(ঞ) শিক্ষা কীভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে?

3. রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay Questions)

(ক) জনসংখ্যার গতি প্রকৃতি আলোচনা করুন।

(খ) জনসংখ্যা পরিবর্তনের উপাদান ও কারণগুলি ব্যাখ্যা করুন।

(গ) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি হিসাবে পরিবার পরিকল্পনার ভূমিকা বিশদ আলোচনা করুন।

(ঘ) প্রজননগত স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশদভাবে উল্লেখ করে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।

একক ৩ ❑ জনসংখ্যা ও জীবনযাত্রার মান (Population and Quality of Life)

গঠন (Structure)

৩.১ সূচনা

৩.২ উদ্দেশ্য

৩.৩ জীবনযাত্রার মান

- ৩.৩.১ সম্পদ
- ৩.৩.২ জীবন যাপনের স্তর
- ৩.৩.৩ সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি
- ৩.৩.৪ বিকাশের প্রক্রিয়া

৩.৪ স্বাস্থ্য ও অস্তিত্ব সহায়ক বিকাশ

- ৩.৪.১ অস্তিত্ব সহায়ক বিকাশের নীতি
- ৩.৪.২ স্বাস্থ্য

৩.৫ যৌনশিক্ষা

- ৩.৫.১ যৌনশিক্ষার উদ্দেশ্য
- ৩.৫.২ যৌনশিক্ষার পাঠক্রম
- ৩.৫.৩ যৌনশিক্ষার শিক্ষণ পদ্ধতি

৩.৬ কৈশোরের শিক্ষা

- ৩.৬.১ কৈশোরের শিক্ষার উদ্দেশ্য
- ৩.৬.২ কৈশোরের শিক্ষার পাঠক্রম

৩.৭ পারিবারিক জীবন সম্পর্কিত শিক্ষা

৩.৮ স্বাস্থ্যবিষয়ক শিক্ষা

৩.৯ সারসংক্ষেপ

৩.১০ অনুশীলনী

৩.১ সূচনা (Introduction)

জীবনযাত্রার মান সম্বন্ধে প্রাথমিক আলোচনা দেখা গেছে জীবনযাত্রার মান উন্নত হলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হয়। বিপরীতক্রমে জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রিত হলে জীবনযাত্রার মানও ক্রমশ উন্নত হয়। কিন্তু জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে নাগরিক ও যান্ত্রিক সভ্যতার বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। এর ফলে নতুন নতুন সমস্যা দেখা দেয়।

বিশেষভাবে পরিবেশের উপর তার প্রভাব প্রায়ই নেতিবাচক হতে দেখা যায়, যা মানুষের জন্য নতুন বিপদ ডেকে আনে। সুতরাং এমন একটি বিকাশ প্রক্রিয়া দরকার যা আমাদের ও চারপাশের জীব পরিমণ্ডলের অস্তিত্বের সংকট সৃষ্টি করবে না। এই বিষয়টি মূলত পরিবেশ শিক্ষার (Environmental Education) অন্তর্গত। জনসংখ্যা শিক্ষায় সেজন্য এদের মধ্যেকার সম্পর্কগুলিই আলোচনা করা হবে।

মানবসভ্যতার অগ্রগতি ও পারিবারিক তথা সামাজিক জীবনের ভিত্তি হল নারী ও পুরুষের মধ্যেকার সম্পর্ক। এই সম্পর্ক সুস্থ হলে সামাজিক জীবনও সুস্থ হবে। যা জীবনযাত্রার মানের অন্যতম উপাদান। কিন্তু পারস্পরিক সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গি, যৌনজীবনের প্রকৃত তাৎপর্য সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকলে যৌনজীবন ভঙ্গুর হয়ে পরে। তবে সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গি আকস্মিকভাবে গড়ে উঠতে পারে না। তারজন্য যৌবন শুরু হওয়ার পূর্ব থেকেই প্রস্তুতি নেওয়া দরকার। কারণ কৈশোরেই শুরু হয়ে যায় যৌনতার বিকাশ। এই প্রসঙ্গগুলিই বর্তমান এককে আলোচিত হবে।

৩.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

- জীবনযাত্রার মান সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে পারবেন এবং জনসংখ্যা শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্ক অনুধাবন করতে পারবেন।
- জনসংখ্যার সঙ্গে অস্তিত্ব সহায়ক বিকাশের সম্পর্ক উল্লেখ করতে পারবেন।
- যৌন শিক্ষা, কৈশোরকালীন শিক্ষা ও পারিবারিক জীবন সম্পর্কিত শিক্ষার ধারণা, উদ্দেশ্য ও পাঠক্রম সম্বন্ধে বলতে পারবেন।
- স্বাস্থ্যবিষয়ক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৩.৩ জীবনযাত্রার মান (Quality of Life)

প্রথম এককে জীবন যাত্রার মান সম্বন্ধে একটি প্রাথমিক রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। জীবনযাত্রার মান নির্ণয়কারী উপাদানগুলির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় এককে জীবনযাত্রার মান ও জনসংখ্যার গতিপ্রকৃতির সম্পর্ক সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে বাকি চারটি উপাদান সম্বন্ধে আরও একটু বিশদভাবে জানা দরকার।

৩.৩.১ সম্পদ (Resource)

সম্পদ হিসাবে পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে অন্যতম প্রধান হল মানব সম্পদ। মানব সম্পদ যদি উৎপাদনের কাজে লাগে তখনই তা সম্পদ বলে গণ্য হয়। মানুষের মেধা অথবা শ্রম অথবা উভয়ের মিলিত প্রয়োগের ফলে যা কিছু উৎপন্ন হয় তার বিনিময়ে ব্যক্তি তার জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, আশ্রয়, নিরাপত্তা, শিক্ষা, বিনোদন, স্বাস্থ্য পরিসেবা সবকিছুর ব্যবস্থা করতে পারে এবং অক্ষম অবস্থায় তার আর্থিক নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করতে পারে। মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রাথমিক দায়িত্ব রাষ্ট্রের হলেও এখানে ব্যক্তির ভূমিকা নগণ্য নয়। জন সংখ্যা

শিক্ষা প্রথম থেকেই শিক্ষার্থীদের কাছে সম্পদ হিসাবে তাদের মূল্য সম্পর্কে অবহিত করতে চেষ্টা করে। এর ফলে শৃংখলাপরায়ণ, পরিশ্রমী, কর্তব্যপরায়ণ, মেধাসম্পন্ন ভবিষ্যৎ নাগরিক তৈরি হয় এবং শিক্ষার্থীদের আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস (Self acstualisation) বৃদ্ধি পায়। মনে রাখতে উপরোক্ত গুণগুলির যে কোন একটির অভাব ঘটলে মানুষের সম্পদমূল্য কমে যায়। মেধাসম্পন্ন কিন্তু পরিশ্রম বিমুখ মানুষের সম্পদ মূল্য কম।

ধন (Capital) যদিও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অঙ্গ এবং অধিকাংশ দেশে ব্যক্তি মালিকানাধীন। কিন্তু ধনের বণ্টন ব্যবস্থায় ও ধন উৎপাদনে নিযুক্ত হলে, তার সুফল অন্য মানুষরাও ভোগ করে। ধন অফুরন্ত নয়। সুতরাং যার যতটুকু ধনসম্পদ আছে তার সুষ্ঠ ব্যবহার জীনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। সুতরাং জনসংখ্যা শিক্ষার মাধ্যমে ধনের উপযুক্ত ব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের প্রথম থেকেই সচেতন করে তোলা যায়। যে শ্রমিক উপার্জনের অধিকাংশ নেশার কাজে ব্যয় করে, তার জীবন যাত্রার মান উন্নত হওয়া অসম্ভব। আবার সঞ্চিত অর্থ (Idle money) সম্পদ হিসাবে মূল্যহীন যদি তা বিনিয়োগ করা হয়। জনসংখ্যার সীমিত থাকলে বিনিয়োগের উপযোগী ধনসম্পদ সৃষ্টি করা যায় এবং তার সাহায্যে জীবন যাত্রার মান আরও উন্নত করা যায়।

সবচেয়ে বড় সচেতনতা দরকার প্রাকৃতিক সম্পদ সম্বন্ধে। জীবাশ্মজাত তৈল (Fossil fuel) ভাণ্ডার প্রায় নিঃশেষিত, কয়লার ভাণ্ডারও একইভাবে প্রায় শেষ হওয়ার মুখে। নির্বিকার বন ধ্বংস করে মানব সভ্যতা সংকটের মুখে। ভূগর্ভস্থ জলস্তর দ্রুত নেমে যাচ্ছে। এক কথায় প্রাকৃতিক সম্পদের নির্বিচার অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার বিশ্ব উষ্ণায়ন, ওজোন স্তরের ক্ষয় প্রভৃতি বিপর্যয় ডেকে আনছে। জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন কথাটির অর্থ বোধহীন ভোগ নয়, এই কথাটি প্রথম থেকেই শিক্ষার্থীদের জানা দরকার যাতে তারা এর প্রতিরোধ করতে পারে এবং নিজেদের জীবনচর্যায় তার প্রতিফলন দেখাতে পারে।

প্রযুক্তির বিকাশ মানুষকে নানাভাবে স্বাচ্ছন্দ্য দিতে যেয়ে বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই ঘটে চলেছে। বিগত তিন দশকে এর অগ্রগতি বিস্ময়কর গতিতে ঘটছে। কিন্তু প্রযুক্তির ফলে মানুষের জীবনে নানা সমস্যাও ডেকে আনছে। সমস্ত প্রযুক্তিই সকলের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নয়। দৈনন্দিন বিনোদন থেকে শুরু করে জীবনের সর্বত্র এমন সব প্রযুক্তির প্রবেশ ঘটেছে যা অর্থ সম্পদের অপচয় যতটা করে ততটা প্রয়োজনীয় নয়। সুতরাং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তির সুফল ও কুফলগুলি বোঝা দরকার এবং প্রযুক্তির সঠিক নির্বাচন ও ব্যবহার করার দক্ষতা অর্জন করা দরকার। এই বিষয়েও শিক্ষার্থীদের প্রথম থেকেই সচেতন হয়ে ওঠা ভালো।

খাদ্যের প্রধান উৎস প্রাকৃতিক ও কৃষিজাত সম্পদ। খাদ্যের সঙ্গে স্বাস্থ্য ও পুষ্টির সম্পর্ক কারও অবিদিত নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও পুষ্টিমূল্যহীন ক্ষতিকর কিন্তু সুস্বাদু খাদ্যের প্রতি সকলের প্রবল আকর্ষণ। এর ফলে ধন সম্পদের অপচয়, স্বাস্থ্যের ক্ষতি ও রোগ ব্যাধির চিকিৎসার জন্য অপরিমিত ব্যয় খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। খাদ্যের অপচয় রোধ, সঠিক খাদ্য নির্বাচন, স্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণ এই সবই প্রকৃত উন্নত জীবনের লক্ষণ। এই প্রসঙ্গটিও জনসংখ্যা শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের কাছে তুলে ধরা যায়।

৩.৩.২ জীবনযাপনের স্তর (Level of living) :

মাথাপিছু গড় জাতীয় উৎপাদনের বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্তি বা পরিবারের কোন ভূমিকা নেই। কিন্তু পারিবারিক আয় কীভাবে কার জন্য কতটা ব্যয় করা হবে, অর্থাৎ মাথাপিছু পারিবারিক বরাদ্দ কীভাবে স্থির করা হবে তা সেই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। একটি নীতিতে প্রয়োজন ভিত্তিক বরাদ্দের কথা বলা হয়। যেহেতু ছোট বড়

সকলের প্রয়োজন সমান নয়, সেহেতু বরাদ্দ হওয়া উচিত প্রয়োজন ভিত্তিক। কিন্তু এই বিষয়ে অনেক সময়ই বৈষম্য সৃষ্টি করার প্রয়াস দেখা যায়। অর্থাৎ প্রয়োজন বিচার করার ক্ষেত্রেই বৈষম্য লক্ষ্য করা যায় (যেমন, ছেলে ও মেয়ে, মা ও বাবা, অবসরপ্রাপ্ত ও কর্মরত ইত্যাদি)। এই জাতীয় বৈষম্য উন্নত জীবনযাত্রার পরিচায়ক নয়। অপর একটি নীতি হল সাম্যের দৃষ্টিভঙ্গি। সকলের জন্য সমান বরাদ্দের নীতিটিও ভ্রান্ত। সেজন্য দুই নীতির মিলিত প্রয়োগ উৎকৃষ্টতম পদ্ধতি। অর্থাৎ মূলত সাম্যের নীতি অনুসরণ করা হলেও, প্রয়োজন দেখা দিলে তার জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ করে সাময়িকভাবে প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা। এই অভ্যাস ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রথম থেকেই গড়ে তোলা দরকার।

স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও বাসস্থান উন্নত জীবন যাত্রার তিন শরিক এবং জন সংখ্যার সঙ্গে বিপরীতমুখী সম্পর্কে সম্পর্কিত। স্বাস্থ্যকর বাসগৃহ, সকলের জন্য যথেষ্ট স্থান সঙ্কুলান হয় এমন বাসস্থান সুস্থজীবন যাপনের জন্য প্রয়োন। আমাদের গ্রামাঞ্চলে অনেক সময়ই অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে আলো বাতাসহীন, ছোট পরিসরের বাসগৃহে অনেকে একসঙ্গে বসবাস করার অসংখ্য নজির আছে। শহরের বস্তি অঞ্চলে, অননুমোদিত স্থানে ঝুপড়ি জাতীয় বাসস্থানের অবস্থা আরও খারাপ। আর্থিক স্বচ্ছলতার প্রথমেই সকলেই চেষ্টা করে বাসস্থান একটু ভালো করতে। প্রায়ই দেখা যায় এই সব বাসস্থানে মা বাবা ও বহু সন্তান একসঙ্গে বসবাস করে। এর ফলে শিক্ষা বা স্বাস্থ্য কোনটারই সংস্থান করা যায় না। মৃত্যু ও জন্মের হারও এদের অনেক বেশি। স্কুল ছুট বা স্কুলে ভর্তি না হওয়ার প্রবণতা বেশি। একটু বড় হয়ে উপার্জনের চেষ্টা, অপরাধ প্রবণতা, অসামাজিক আচরণ, নেশা করার প্রবণতা খুব বেশি। এই বিষয়গুলি জনসংখ্যার পক্ষে বিপজ্জনক এবং তা নিয়ন্ত্রণের একমাত্র উপায়, জীবন যাপনের উন্নতি সাধন, সন্তানের শিক্ষা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা ও নজরদারি।

৩.৩.৩ সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি (Socio-political system)

সমাজের কুপ্রথা (বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা, জাতিভেদ ইত্যাদি) দূর না হলে কোন সমাজের পক্ষে উন্নতি করা সম্ভব নয়। শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা যথেষ্ট বিস্তারলাভ করা সত্ত্বেও আমাদের সমাজে এই প্রথাগুলি আরও শক্তিশালী হয়ে ক্রমশ সমাজের প্রধান চালিকা শক্তি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বহু তথাকথিত রাজনৈতিক নেতা ভেদাভেদকে হাতিয়ার করে নিজেদের প্রতিষ্ঠা ও কুখ্যাতি অর্জন করছেন। ধর্মের ভেদ, জাতিভেদ, সম্প্রদায়গত ভেদ, ভাষার ভিত্তিতে ভেদাভেদ ইত্যাদি অসংখ্য বিষয়ে মানুষে মানুষে বিচ্ছিন্নতাবোধ তৈরি হচ্ছে। এদিক থেকে দেখতে গেলে আমাদের ভারতীয় সমাজ এখন পশ্চাৎমুখী।

বিদ্যালয় স্তর থেকেই ভেদাভেদ সম্বন্ধে নেতিবাচক প্রতিন্যাস তৈরি না হলে, মানবিক মূল্যবোধ তৈরি না হলে এবং অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতা দূর না হলে এই অবস্থার পরিবর্তন অসম্ভব। ধর্মীয় আচরণ অপেক্ষা ধর্মীয় মূল্যবোধ, যা সমস্ত ধর্ম সম্বন্ধেই শ্রদ্ধার মনোভাব পোষণে সাহায্য করে, তাকে প্রাধান্য দিতে হবে। জনসংখ্যা শিক্ষা এই ভেদাভেদহীন, কুসংস্কার মুক্ত, যুক্তিবাদী নাগরিক তৈরি করায় বিশেষ সদর্থক ভূমিকা নিতে পারে। কোন কোন সম্প্রদায় সন্তান ধারণের বিষয়টিকেও ধর্মীয় আবেগের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়ায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ দুরূহ হয়ে উঠছে। জীবন যাত্রার মানও যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও উন্নত হচ্ছে না।

জীবনযাপনের দৈনন্দিন সূচি লক্ষ করলে দেখা যায় প্রত্যেক পরিবারেই কিছু নিয়মনীতি আছে। তাদের আহার, নিদ্রা, কাজ, বিনোদন, সামাজিকতা সবকিছুর মধ্যেই একধরনের শৃংখলা সজাগ থাকে। এই সব পরিবারে সময়ের

সদ্ব্যবহার, সম্পদের সদ্ব্যবহার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন সবকিছুর মধ্যে সামঞ্জস্য দেখা যায়। এই জাতীয় জীবন শৈলী উন্নত জীবন যাপনের সূচক। এই সব পরিবারে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব, সমানাধিকারের মনোভাব, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক ভিত্তির প্রতি শ্রদ্ধা ইত্যাদি থাকায় এদের পরিবারের আকৃতি সব সময়ই ছোট থাকে। বিপরীত ক্রমে বহু পরিবারের জীবনযাত্রা প্রণালী বিশৃংখলা। এদের জীবন যাত্রায় উপরোক্ত জীবন থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র দেখা যায়। পরস্পর সমন্বয় ও বোঝাপড়ার অভাব, আত্মকেন্দ্রিকতা, তিক্ত সম্পর্ক এই সব পরিবারের বৈশিষ্ট্য। সুস্থ জীবন শৈলীর শিক্ষা বিদ্যালয় স্তর থেকেই শুরু করা দরকার। জনসংখ্যা শিক্ষার ভূমিকা এক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ। বলা বাহুল্য এর ফলে পরিবারের আকৃতি সীমিত রাখার প্রস্তুতিও সম্পন্ন হয়।

৩.৩.৪ বিকাশের প্রক্রিয়া (Process of Development)

এখানে বিকাশের প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বর্তমান উদার, অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়, এককভাবে কোন রাষ্ট্রের অর্থনীতিকে সচল রাখা কঠিন। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের প্রসঙ্গটি সরাসরি আমাদের জীবনকে স্পর্শ না করলেও, এ সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা দেশের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি বোঝার পক্ষে সহায়ক হয়। যেমন, অনেক সময় হয়ত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি দায়ী। পরিবারের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখার মত ক্ষুদ্র বিষয়ের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মত বৃহৎ বিষয়ের যোগাযোগ টানা কঠিন কিন্তু দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্যের সম্পর্ক সরাসরি। সেজন্য তার প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা থাকা ভালো।

৩.৪ স্বাস্থ্য ও অস্তিত্ব সহায়ক বিকাশ (Health and Sustainable Development)

1972 সালে Stockholm Conference on Human Development এবং মেক্সিকো শহরে অনুষ্ঠিত International Conference on Population (1984) এ অস্তিত্ব সহায়ক বিকাশের প্রসঙ্গটি প্রধান আলোচ্য বিষয় হিসাবে স্থান পায়। The International Planned Parenthood Federation (IPPF) এবং International Union for Conservation of Natural Resource (IUCN) ও বিকাশের এই অভিমুখ বিশেষভাবে সমর্থন করে। 1987 সালে নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী Mrs. Brundtland এর নেতৃত্বে The World Commission on Environment and Development-এ অস্তিত্ব সহায়ক বিকাশ প্রক্রিয়াকে কেন্দ্রীয় বিষয় হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল।

সাধারণভাবে আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক পরিবেশ ধ্বংস হওয়ার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। জনবসতির বিস্তার ও নগরায়ণের ফলে অরণ্য ধ্বংস হয়েছে প্রভূত পরিমাণে। অধিক খাদ্য সংস্থান করতে যেয়ে জীবকূল ধ্বংস হচ্ছে। কলকারখানা, গাড়ীর ধোঁয়ায় উৎপন্ন কার্বন ডাই অক্সাইড ও কার্বন মনোঅক্সাইড, সালফার ডাই অক্সাইড প্রভৃতি গ্রীণহাউস গ্যাস ওজন স্তর ক্রমশ পাতলা করে দিচ্ছে, যা প্রকৃত পক্ষে মানব সভ্যতার অস্তিত্বের সংকট সূচিত করছে। অথচ সভ্যতার বিকাশ স্তব্ধ করা অসম্ভব।

অস্তিত্ব সহায়ক বিকাশ (Sustainable development) কথাটির অর্থ বিকাশ প্রক্রিয়ার জন্য সেইসব কৌশল

ও পদ্ধতি অবলম্বন করা যা বিকাশের গতিকে ব্যাহত না করেও আমাদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলবে না। পরিবেশের ভারসাম্য অক্ষুণ্ণ রেখে পরিবেশবান্ধব বিকাশ প্রক্রিয়ার কথা চিন্তা করতে গেলে জনসংখ্যা, পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কিত নীতি (National resource policies) এবং জাতীয় বিকাশ নীতি (National Development Policies) ইত্যাদির মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করা দরকার। যে সব বিষয়গুলি এই প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয় তার বিস্তারিত আলোচনা পরিবেশ শিক্ষার পাঠে করা হবে। এখানে মূলনীতিগুলির উল্লেখ করে জনসংখ্যার সঙ্গে এর সম্পর্কের কথা আলোচনা করা হবে। সেইসঙ্গে জনশিক্ষার ভূমিকার কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার।

৩.৪.১ অস্তিত্ব সহায়ক বিকাশের নীতি (Principles of Sustainable development)

অস্তিত্ব সহায়ক বিকাশের প্রধান নীতিগুলি স্থির করা হয় পরিবেশ, মানুষের চাহিদা ও বিকাশের প্রক্রিয়াকে একযোগে বিচার করে।

পরিবেশের ক্ষতিকারক বিষয়গুলি চিহ্নিতকরণ (Identification of the environment damaging factors) সাধারণভাবে কোন্ কোন্ বিষয় পরিবেশ ধ্বংসের সঙ্গে যুক্ত সেগুলি চিহ্নিত করার পাশাপাশি অঞ্চল বিশেষের পরিস্থিতিও চিহ্নিত করা দরকার। বৃক্ষচ্ছেদন, অরণ্যবিনাশ সর্বত্র সমান নয়। কলকারখানার ধোঁয়া সর্বত্র সমানভাবে বাতাসকে দূষিত করে না। রাসায়নিক বর্জ্যের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। আমাদের গ্রামীণ সমাজে যে পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয়, পাশ্চাত্যদেশে দৈনন্দিন জীবনে অনেক বেশি তাপ উৎপাদনের প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ অনেক বেশি জ্বালানি ব্যবহার করা হয়। যে সমস্ত বিষয় এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য তা নিচে দেওয়া হল।

— অরণ্য ধ্বংস ও বৃক্ষচ্ছেদন।

— বন্যা ও বৃক্ষচ্ছেদনের জন্য ভূমিক্ষয়।

— রাসায়নিক ও অবিনশ্বর অজৈব বর্জ্য নিষ্কাষণ।

— কীটনাশক রাসায়নিক সার ও অরণ্য ধ্বসের ফলে খাদ্য শৃংখল (Food cycle) নষ্ট হয়ে জীবকূল ধ্বংস হওয়া।

— জল সম্পদ বিনষ্ট হওয়া।

— উষ্ণায়ন।

— বায়ুদূষণ।

— খাদ্য দুষণ।

— এসিড বৃষ্টি।

বিকাশের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের সঙ্গে ক্ষতিকারক বিষয়গুলি চিহ্নিত করা (Identification of damaging factors in specific developmental area)

সমস্ত রকম ক্ষতিকারক বিষয় সমস্ত বিকাশের ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। কৃষির সঙ্গে যেমন কীটনাশক ও রাসায়নিক সার যুক্ত তেমনি, নগরায়নের সঙ্গে যুক্ত গ্রীণ হাউস গ্যাসের উৎপাদন, বৃক্ষচ্ছেদন, বায়ু ও জল দূষণ, ইত্যাদি। নির্দিষ্টভাবে এইগুলি চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া দীর্ঘকাল ধরেই শুরু হয়েছে। এইভাবে চিহ্নিত করার ফলে সঠিক কৌশল উদ্ভাবন করা, প্রযুক্তির বিকাশ ও অন্যান্য প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা যাবে। কিছু কিছু পদক্ষেপ

নেওয়া হলেও সংকট যে ঘনীভূত তার প্রমাণ বিশ্ব উষ্ণায়নের (Global warming) ফলে পৃথিবীর জলবায়ু ও তাপমাত্রায় বিপুল পরিবর্তন এবং তার ফলে সারা পৃথিবীর আবহাওয়ার পরিবর্তন, অসময়ে ঘন ঘন অদৃষ্টপূর্ব প্রাকৃতিক বিপর্যয় ইত্যাদি লক্ষ করা যাচ্ছে।

উপযুক্ত কৌশল গ্রহণ করা (Adopting appropriate strategies) উপরোক্ত বিষয়গুলি চিহ্নিত করা হলে, তার জন্য সঠিক কৌশল স্থির করে কার্যকর করা দরকার। দুই প্রকার কৌশলের কথা চিন্তা করেন পরিবেশ বিজ্ঞানীরা। প্রথমটি প্রতিরোধমূলক এবং দ্বিতীয় প্রকার কৌশল প্রতিকারমূলক।

প্রতিরোধমূলক কৌশল (Preventive strategies) এমন কৌশল গ্রহণ করা দরকার, যাতে তার ক্ষতি না হয়। যথাসম্ভব ক্ষতিকারক বিষয়গুলি সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করাই প্রতিরোধমূলক কৌশলের মূল কথা। কয়েকটি উদাহরণ,

— রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈব সারের ব্যবহার।

— জৈব প্রযুক্তির ব্যবহার।

— অন্যান্য প্রযুক্তির পরিবর্তন (পেট্রোল চালিত যানের প্রযুক্তি এবং রেফ্রিজারেটার ও ফ্লুরোকার্বন ব্যবহার বন্ধ করার প্রযুক্তি এর উদাহরণ।

— বৃক্ষচ্ছেদন বন্ধ করা।

— জলাভূমি সংরক্ষণ

— আবাসন, প্রাকৃতিক সম্পদ ইত্যাদি সম্বন্ধে পরিবেশ বান্ধব নীতি ও আইন প্রণয়ন।

— জল সম্পদ ও বন্য প্রাণী সংরক্ষণ।

প্রতিকারমূলক কৌশল (Remedial strategies) এমন সব কৌশল গ্রহণ করা যার সাহায্যে যতটা সম্ভব পরিবেশের ক্ষতিপূরণ করে পরিস্থিতির উন্নতি করা যায়। এরকম কয়েকটি উদাহরণ।

— নতুন বন সৃজন এবং সর্বত্র বৃক্ষরোপণ।

— মরু অঞ্চলে এবং বড় বড় শহরে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করে ভূগর্ভস্থ জলস্তর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা।

— জ্বালানি ব্যবহার কমিয়ে প্রাকৃতিক শক্তি থেকে তাপ উৎপাদন করা (যেমন, সৌরবিদ্যুৎ, বায়ুচালিত জেনারেটর ইত্যাদি।

— লুপ্ত প্রায় প্রাণীর প্রজনন কেন্দ্র তৈরি করে বংশবৃদ্ধির সুযোগ দেওয়া।

সর্বস্তরে জনসাধারণের অংশগ্রহণ (People's Participation at every stage) : শুধুমাত্র প্রচার ও জনমত গঠনের অসারতা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে। আইনের সুযোগ নিয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থ যতটা রক্ষিত হয়, প্রকৃত কাজ সেভাবে হয় না। বিশেষত আইন সবসময়ই সঙ্কীর্ণ একটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। ফলে সামগ্রিকভাবে অস্তিত্ব সহায়ক বিকাশের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি একমাত্র সর্বসাধারণের অংশগ্রহণের মাধ্যমেই সার্থক হতে পারে। বিজ্ঞানীরা তার নেতৃত্ব দিতে পারেন। নীতিগতভাবে বিকাশের কোন প্রক্রিয়াই জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে কার্যকর হয় না। অস্তিত্ব সহায়ক বিকাশের ক্ষেত্রেও কথাটি সমানভাবে প্রযোজ্য।

জনসংখ্যা শিক্ষা এবং পরিবেশ শিক্ষার কার্যকারিতা ঠিক এই জায়গায়। জনসংখ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্য আলোচনা করার সময় প্রতিন্যাস ও মূল্যবোধ গঠনের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। গবেষণার ফলাফল থেকে দেখা যায় শুধুমাত্র বিষয়বস্তু পাঠ ও সচেতনতা মূল্যবোধ গঠনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। সেজন্য প্রতিটি পদক্ষেপ সংশ্লিষ্ট

জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে নেওয়া দরকার। বৃক্ষরোপণ ও তার সঙ্গে জনসংখ্যার সম্পর্ক বুঝলেই হবে না, বৃক্ষরোপণ করে তাকে বাচিয়ে রাখার কাজে অংশগ্রহণ করলে তবেই প্রকৃত পরিবেশ সংরক্ষণ সম্ভব হবে। জৈব সারের উৎপাদন ও ব্যবহার আমাদের দেশে অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু রাসায়নিক সারের প্রয়োগে প্রথম দিকে ফসল উৎপাদন কোথাও দ্বিগুণ কোথাও তিনগুণ হওয়ার ফলে, আবার জৈব সারের যুগে ফিরে যাওয়ার জন্য নতুন প্রজন্মের কৃষকদের সক্রিয় সহযোগিতা দরকার। জনসংখ্যা শিক্ষা এই ব্যাপারে প্রাথমিক পদক্ষেপ নিতে পারে যাতে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাও কিছু কিছু পরিবেশ বান্ধব আচরণ আয়ত্ত করতে পারে, এবং অস্তিত্ব সহায়ক পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করতে এগিয়ে আসে।

৩.৪.২ স্বাস্থ্য (Health)

স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কিছু আলোচনা জীবনযাপনের মান প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। এখানে সেজন্য দুটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হবে, তার একটি স্বাস্থ্য ও পরিবেশের সম্পর্ক এবং অপরটি স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যার সঙ্গে সম্পর্ক। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা দিতে যেয়ে বলেছে, স্বাস্থ্য একটি সামগ্রিক স্বাচ্ছন্দ্যের অনুভূতি বা অবস্থা, শুধুমাত্র রোগব্যাধির অনুপস্থিতি নয় (Health is a state or feeling of complete wellbeing and not merely the absence of diseases or disorder)।

এই সংজ্ঞা অনুযায়ী শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য আলাদা কিছু নয় বরং পরস্পর সম্পৃক্ত। তবে প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী অনেকে শারীরিক স্বাস্থ্যকে আলাদা করে দেখেন। স্বাস্থ্যের নির্ধারক বিষয়গুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়।

জৈবিক তথা জেনেটিক গঠন (Biological vis-a-vis genetic constitution) নানা শারীরিক অবস্থা ব্যাধি স্বাস্থ্যহীনতার সম্ভাবনা তৈরি করে থাকে। তার কিছু কিছু জন্মগতভাবে পিতা-মাতার সুপ্ত জিন (Recessive gene) বাহিত হয়ে সন্তানের মধ্যে স্বাস্থ্যহীনতার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। থ্যালাসেমিয়া, গ্যালাক্টোসেমিয়া বা ফেনাইলকিটোনিউরিয়া (Thallcemia, Galactocimia, Phenyleketoneuria) এর উদাহরণ।

পরিবেশ (Environment) : প্রাক্‌জন্মকালীন অবস্থায় গর্ভাশয়ের পরিবেশ (যেমন, মাতার দৈনিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, পুষ্টি, নেশা, ক্ষতিকারক intoxication ইত্যাদি) এবং জন্ম পরিবর্তীকালে বাইরের পরিবেশ স্বাস্থ্যের গতি প্রকৃতি ও অবস্থা স্থির করে দেয়। যেমন, দূষিত পরিবেশের চেয়ে দূষণমুক্ত পরিবেশে স্বাভাবিকভাবেই স্বাস্থ্য ভালো থাকে। জল, বায়ু ও খাদ্য এই তিনটি উপাদানের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

জীবনশৈলী (Style of living) : এর মধ্যে আছে স্বাস্থ্যসম্মত জীবন যাপনের অভ্যাস, নিয়মানুবর্তিতা, পরিচ্ছন্নতা, ব্যক্তিগত যত্ন, পুষ্টির বিষয়ে সচেতনতা ইত্যাদি।

আর্থসামাজিক অবস্থা (Socio-economic status) : শিক্ষা, পেশা, আয়, মাথাপিছু ব্যয়, বাসস্থানের অবস্থা ও পরিবেশ এই সব মিলিয়ে আর্থসামাজিক অবস্থার ভিত্তিতে স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব পড়ে। সাধারণভাবে সমাজের তথাকথিত নিচুতলার মানুষের স্বাস্থ্য সচেতনতা কম। যতটা সচেতনতা আছে তা আর্থিক অনটনের জন্য গ্রাহ্য করার উপায় থাকে না। ফলে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।

সামগ্রিক স্বাস্থ্য পরিসেবা (Comprehensive health services) : এর অর্থ চিকিৎসা, টীকাকরণ ও

অন্যান্য প্রতিরোধমূলক সুযোগ কতটা আছে, এই প্রসঙ্গে ভারতীয় সংবিধানের Article 47 এ বলা হয়েছে।

The State shall regard the raising of the level of nutrition and standard of living of its people and the iomprovement of public health among its primary duties....

এছাড়াও অন্যত্র নাগরিকদের স্বাস্থ্য রক্ষায় রাষ্ট্রের দায়িত্বের কথা বলে দেওয়া হয়েছে। এজন্য প্রত্যেক ব্যক্তির চিকিৎসার সুযোগ তার নাগালের মধ্যে থাকা দরকার। না হলে স্বাস্থ্যহীনতার কোন প্রতিকার হওয়া সম্ভব নয়। ভারতে এখনও বহু অঞ্চলে স্বাস্থ্য পরিসেবা সহজলভ্য নয়। হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছাতে 15-20 কিলোমিটার যাওয়ার ঘটনা কম নেই। আবার সমস্ত পরিসেবা সর্বত্র পাওয়া যায় না। ছোট হাসপাতাল থেকে বড় হাসপাতালে পাঠানোর ঘটনাও অবিরাম ঘটে।

বর্তমানে স্বাস্থ্য পরিসেবায় ব্যক্তি মালিকানা বিপুলভাবে যুক্ত হওয়ায় অধিকাংশ দরিদ্র মানুষের পক্ষে স্বাস্থ্য পরিসেবা দুর্মূল্য হয়ে উঠেছে। সেজন্য আরও বেশি করে স্বাস্থ্য সচেতনতা গড়ে তোলা দরকার।

স্বাস্থ্যের মান (Quality of health)

স্বাস্থ্যের মান কয়েকটি বিশেষ সূচক দ্বারা নির্ণয় করা হয়েছে।

মৃত্যু বিষয়ক সূচক (Mortality indicator) : স্থূল মৃত্যু হার। জন্মের সময় জীবনের প্রত্যাশা, শিশু মৃত্যুর হার, প্রসূতি মৃত্যুর হার, বিশেষ রোগে মৃত্যু ইত্যাদি প্রসঙ্গগুলি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

রোগ সম্ভাবনার সূচক (Morbidity rate) : এখানে দুটি সূচক ব্যবহার করা হয়, Incidence rate ও Prevalence rate. কোন নির্দিষ্ট সময়ে (যেমন, এক বছরে) এই দুটি সূচক নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে নির্ণয় করা হয়।

$$\text{Incidence rate} = \frac{\text{নতুন রোগাক্রান্তের সংখ্যা}}{\text{জনতার যে অংশের রোগটি হওয়ার মত পরিস্থিতি রয়েছে}}$$

$$\text{Prevalence rate} = \frac{\text{নতুন ও পুরানো রোগাক্রান্তের সংখ্যা}}{\text{মোট জনসংখ্যা}}$$

পুষ্টিজনিত সূচক (Nutritional indicator) : এর অন্তর্গত হল, জন্মকালীন ওজন, বয়সোচিত ওজন, বয়সোচিত উচ্চতা, উচ্চতা মাফিক ওজন, বাহুর পরিধি, ত্বকভাঁজ করে তার বেধ।

স্বাস্থ্য পরিসেবার সূচক (Health care indicator) : এই সূচক পরিমাপ করা হয় পাঁচটি বিষয়ে।

(১) ডাক্তার ও জনসংখ্যার অনুপাত।

(২) ডাক্তার ও সেবিকার সংখ্যার অনুপাত।

(৩) শয্যা ও জনসংখ্যার অনুপাত।

(৪) জনসংখ্যা ও হাসপাতালের অনুপাত।

(৫) জনসংখ্যা ও গ্রামীণ প্রসবকারিণীর অনুপাত।

সদ্ব্যবহারের হার (Utilisation rate) : এই সূচকটি পরিমাপ করা হয়।

(১) দুই বছরের নীচে কত শিশুর টীকাকরণ হয়েছে (তালিকাভুক্ত সংক্রমনের সংখ্যা)

(২) কত সংখ্যক মহিলা গর্ভকালীন পরিসেবা গ্রহণ করেছেন।

(৩) কত সংখ্যক মহিলার শিক্ষিত সেবিকার হাতে প্রসব করিয়েছেন।

(৪) শয্যা পিছু কতজন ভর্তি হয়েছেন।

(৫) হাসপাতালে গড় পরতা কতদিন এক একজন ভর্তি ছিলেন।

সামাজিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের সূচক (Social and mental health indicate)

(১) আত্মহত্যার হার।

(২) অপরাধের হার।

(৩) পথ দুর্ঘটনার হার।

আর্থ সামাজিক সূচক (Socio-economic indicator)

(১) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার।

(২) মাথাপিছু GNP।

(৩) বেকারত্বের স্তর।

(৪) নির্ভরতার অনুপাত।

(৫) বয়স্ক শিক্ষিতের হার।

জীবনযাত্রার মানের সূচক (Quality of life indicator) : তিনটি বিষয় একত্রে যোগ করে The Physical Quality of Life Indiex (PQLI) নির্ণয় করা হয়, শিশু মৃত্যু, জীবনের প্রত্যাশা (কোন বয়সে) এবং ঐ বয়সে স্বারক্ষতার হার।

স্বাস্থ্যের উপরোক্ত সূচকগুলির মধ্যে সমস্ত প্রসঙ্গ জনসংখ্যার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নয়। কিন্তু একথা ঠিক যে জনসংখ্যা সীমিত থাকলে স্বাস্থ্যের সূচকগুলিও সেই অনুপাতে পরিবর্তিত হবে এবং উন্নততর স্বাস্থ্য সূচিত করবে। স্বাস্থ্যের নির্ধারক বিষয়গুলির মধ্যে পরিবেশ অন্যতম। সুতরাং স্বাস্থ্য ও পরিবেশ পরস্পর সম্পর্কিত। শুধু তাই নয় যে সূচকগুলির কথা উল্লেখ করা হল তারমধ্যে কয়েকটি পরিবেশের গুণগত প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। এইজন্যই বলা হয় জনসংখ্যা, পরিবেশ ও স্বাস্থ্য এই তিনটি বিষয় জনসংখ্যা শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু।

জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং ভবিষ্যৎ জীবনের মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রথমে যৌন শিক্ষা পরে যথাক্রমে কৈশোরের শিক্ষা এবং পারিবারিক জীবন সম্পর্কিত শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা হয়।

৩.৫ যৌন শিক্ষা (Sex Education)

শিক্ষা বিজ্ঞানে কৈশোর (Adolescence) এবং মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা (Mental Hygiene) দীর্ঘকাল ধরেই অন্যতম প্রধান চর্চার বিষয়। ফলে বিগত পঞ্চাশ বছর ধরেই বিদ্যালয়ে যৌন শিক্ষাকে পাঠ্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার একটি সোচ্চার দাবি শিক্ষাবিদ্‌রা করে আসছেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে রক্ষণশীলতা খুবই প্রবল থাকায় তা কখনই কার্যকর করা হয়ে ওঠেনি। বর্তমানে ব্যাপকভাবে AIDS সংক্রমণ, নেশা করার প্রবণতা, যৌন নির্যাতন ইত্যাদি

বৃদ্ধি পাওয়ায় একটু ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে আরও বৃহত্তর উদ্দেশ্য নিয়ে বিষয়টির চর্চা শুরু হয়েছে। সে হিসাবে যৌন শিক্ষা নামটি পরিত্যক্ত হলেও তার বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত হয়েছে পারিবারিক জীবনের শিক্ষা (Family Life Education) বা কখনও জীবনশৈলীর শিক্ষা (Life style Education) নামক বিষয়ের মধ্যে। সেজন্য সংক্ষেপে যৌন শিক্ষার বিষয়টি উল্লেখ করা দরকার।

৩.৫.১ যৌন শিক্ষার উদ্দেশ্য (Objectives of Sex Education)

যৌন শিক্ষার উদ্দেশ্য কিছুটা সীমাবদ্ধ :

যৌনাঙ্গ ও প্রজনন বিজ্ঞানের সাধারণ অথচ সঠিক তথ্য দান।

কৈশোরকালীন যৌন পরিবর্তনগুলির তাৎপর্য ব্যাখ্যা।

যৌন জীবনের গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত করা।

নারী ও পুরুষের সুস্থ সম্পর্কের ক্ষেত্রে যৌনতার ভূমিকা।

সম্ভাব্য বিপদ ও সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন করা।

৩.৫.২ যৌন শিক্ষার পাঠক্রম (Curiculum of Sex Education)

সরাসরি স্বতন্ত্রবিষয় হিসাবে যৌন শিক্ষা কখনই স্কুল পাঠক্রমে অনুমোদন পায়নি। প্রধানত জীবন বিজ্ঞানের পাঠে যৌন ও আযৌন প্রজনন (Sexual and asexual reproduction) সম্পর্কিত অংশগুলির মাধ্যমে যৌন শিক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু মানুষের যৌন জীবন অনেক জটিল ও তার সঙ্গে শুধুমাত্র শারীরিক নয় মানসিক বিষয়ও অনেকটা জড়িত, সেহেতু জীবন বিজ্ঞানের পাঠে কোন উদ্দেশ্য সাধিত হয়নি।

২.৫.৩. যৌনশিক্ষার শিক্ষণ পদ্ধতি (Method of Teaching Sex Education)

এই বিষয়টিও বিতর্কিত এবং বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু রক্ষণশীলতা বনাম আধুনিকতা। জীবন বিজ্ঞান পড়ানোর সময় মানুষের প্রজননের প্রসঙ্গটি তুলে ধরার প্রস্তাব অনেকেই প্রত্যাখ্যান করেছেন। শিক্ষিকারা মেয়েদের এবং শিক্ষকরা ছেলেদের পড়াবেন কিনা এই বিতর্কও কম হয়নি। এমন কি এই বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হবে কিনা এই জাতীয় তুচ্ছ বিতর্কও অনেকে তুলেছেন। আশ্চর্য এই যে এই বিষয়টিকে এখনও কোন কোন ব্যক্তিবর্গ রাজনৈতিক বিষয় করে তুলতে চাইছেন। শিক্ষকদের মতামতও দ্বিধাবিভক্ত। শুধু তাই নয় প্রত্যেকেই নিজস্ব স্বার্থে বিষয়টি পরিচালিত করতে চেয়েছেন। যেমন, কোন কোন NGO যৌনশিক্ষা সংক্রান্ত যে কোন কার্যক্রমকে কেবল মাত্র যৌনতাবাহিত রোগ সম্বন্ধে শিক্ষা ও জন্মশাসন প্রণালী ব্যবহারের শিক্ষার হিসাবে পরিচালিত করার পক্ষে সওয়াল করেছেন। পরবর্তী কালে যৌন শিক্ষার বদলে কৈশোরের শিক্ষা নামটি দেওয়ার প্রস্তাব ওঠে এবং যৌন শিক্ষা শব্দটি বাতিল হয়ে যায়।

৩.৬ কৈশোরের শিক্ষা (Adolescent Education)

জাতীয় শিক্ষানীতি (1986) এবং পরবর্তীকালে 1992 সালের Programme of Action থেকে প্রাপ্ত

সুপারিশ অনুযায়ী বিদ্যালয় স্তরে যৌনশিক্ষার পরিবর্তে কৈশোরের শিক্ষা (Adolescent Education) প্রচলন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। কৈশোরের শিক্ষার উদ্দেশ্য যৌন শিক্ষার উদ্দেশ্যের চেয়ে কিছুটা ব্যাপক।

২.৬.১ কৈশোরের শিক্ষার উদ্দেশ্য (Objectives of Adolescent Education)

এই বিষয়টি যে উদ্দেশ্যে প্রচলন করার চেষ্টা হয়েছিল তা নিম্নরূপ—

শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারবে কৈশোরকালীন পরিবর্তনগুলি স্বাভাবিক এবং বড় হওয়ার প্রথম পদক্ষেপ।

পরিবর্তনগুলির কারণ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে সমস্ত বিষয়টি বুঝতে সাহায্য করা।

যৌনাঙ্গ ও প্রজনন বিষয়ে সঠিক তথ্য জানানো।

সন্তান জন্মের বিষয়টি সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা দেওয়া।

কৈশোরের শারীরিক ও মানসিক সমস্যাগুলি কাটিয়ে ওঠা এবং সঠিক অভিযোজনে সাহায্য করা।

যৌনতাবাহিত রোগগুলি সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান ও তার বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক করা।

রোগগুলির প্রতিরোধের উপায় সম্বন্ধে জ্ঞান।

ছেলেদের এবং মেয়েদের পরস্পর সমমর্যাদা দান ও শ্রদ্ধাশীল মনোভাব গড়ে তোলা।

২.৬.২ পাঠক্রম (Curriculum)

1997-98 সালে NCERT কৈশোরের শিক্ষার পাঠক্রম ও পাঠ্যবিষয়গুলি রচনা করার একটি উদ্যোগ নিয়েছিল। সেই উদ্যোগ অনুযায়ী রাজ্যস্তরে SCERTগুলিও আঞ্চলিক ভাষায় পাঠ রচনার কাজ শুরু করেছিল। এই পাঠের দুটি অংশ ছিল। প্রথম অংশ জীবন বিজ্ঞান ও সমাজবিদ্যার পাঠক্রমের সঙ্গে সমন্বয় করে প্রজনন বিজ্ঞান (Reproductive Biology) ও মানুষের প্রজনন সম্বন্ধে পড়ানোর কথা হয়েছিল। দ্বিতীয় অংশটি সরাসরি স্বতন্ত্রভাবে যৌনতাবাহিত রোগ, তাদের কারণ, সংক্রামণের পদ্ধতি, রোগলক্ষণ, সম্ভাব্যবিপদ ও প্রতিরোধ সম্বন্ধে ধারণা দেওয়ার জন্য রচনা করা হয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত কৈশোরের শিক্ষাও ব্যাপকভাবে প্রচলন করা যায়নি। এবং যেহেতু প্রচলন করা যায়নি, সেহেতু শিক্ষণ পদ্ধতির প্রশ্নটিও অবান্তর হয়ে যায়।

৩.৭ পারিবারিক জীবন সম্পর্কিত শিক্ষা (Family Life Education)

পারিবারিক জীবন সম্পর্কিত শিক্ষার সঙ্গে কৈশোরের শিক্ষার মৌলিক পার্থক্য সামান্যই। এই বিষয়টির সিংহভাগ জুড়ে আছে কৈশোরকালীন পরিবর্তনগুলির বিশদ পরিচিতি। বিকাশের ধারাবাহিকতা সম্বন্ধে ধারণা দেওয়ার জন্য তার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে শৈশবকালনী যৌনতা (Infantile sexuality) এবং বাল্যকালীন যৌনতা (Childhood sexuality)। সেই সঙ্গে প্রজনন সম্বন্ধে সরাসরি শিক্ষাদান, শিশুর জন্ম বৃত্তান্ত সম্বন্ধে জ্ঞান এই সবকিছুই পারিবারিক জীবন সম্পর্কিত শিক্ষায় স্থান পেয়েছে। যৌনতা বাহিত রোগ, নানা ধরনের নেশার দ্রব্য ও তার কুফল, যথেচ্ছ ঔষধ অকারণে ব্যবহারের কুফল ইত্যাদি বিষয়ে শেখানোর প্রয়াসও রয়েছে বিষয়বস্তুর মধ্যে। সামগ্রিকভাবে যা কিছু একজন কিশোর বা কিশোরীর পক্ষে আত্মরক্ষার জন্য, ভবিষ্যৎ সুস্থ জীবনযাপনের জন্য জানা প্রয়োজন তার সব কিছুই আছে পারিবারিক জীবন সম্পর্কিত শিক্ষায়।

কৈশোরের শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলির অতিরিক্ত যে সব উদ্দেশ্য স্থির করা হয়েছে তা হল,

জীবন ও পরিবার সম্বন্ধে সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা।

দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা এবং দায়িত্বগুলি সম্বন্ধে সচেতন করা।

অনৈতিক কাজ ও নেশা সম্বন্ধে আন্তরিক বিরাগ সৃষ্টি করা।

সহনশীলতা ও অভিযোজন।

উন্নত নৈতিকবোধ।

পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব।

নানা বাধা অতিক্রম করে এর জন্য স্বতন্ত্র্য পাঠ রচনা করা হয়েছে এবং তা কার্যকর করা হয়েছে। পরিণতি সম্বন্ধে মন্তব্য করার সময় এখনও আসেনি।

৩.৮ স্বাস্থ্যবিষয়ক শিক্ষা (Health Education)

বিদ্যালয় স্তরে স্বাস্থ্যবিদ্যা পাঠের প্রচলন প্রায় শতাব্দীকাল ধরেই প্রচলিত। সে হিসাবে স্বাস্থ্যবিষয়ক শিক্ষা কোন অভিনব পরিকল্পনা নয়। তবে জনসংখ্যার পরিবর্তন, সামগ্রিক বিকাশ, ব্যাপক বাধ্যতামূলক টীকাকরণ ইত্যাদির ফলে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য তথ্যের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে যদিও মৌলিক নীতিগুলি একই আছে। স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যগুলি এই,

জলবাহিত, খাদ্যবাহিত ও বায়ুবাহিত সাধারণ যোগগুলি সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান।

ঐ সব রোগের লক্ষণ ও প্রতিরোধ পদ্ধতি।

পরিচ্ছন্নতাবোধ ও অভ্যাস।

স্বাস্থ্যকর খাদ্য, পানীয় ও পুষ্টি সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান।

নিজের, পরিবারের এবং সম্প্রদায়গতভাবে স্বাস্থ্য সচেতনতা।

প্রাথমিক প্রতিবিধান (First Aid)।

প্রাথমিক সুশ্রুষা।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মূল্যবোধ গড়ে তোলা।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বাস্থ্যবিদ্যা স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে পাঠ্য তালিকায় স্থান পায়।

৩.৯ সারসংক্ষেপ (Summary)

জীবনযাপনের মান নির্ধারক উপাদানগুলির মধ্যে সম্পদ, জীবন যাপনের স্তর, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং বিকাশ প্রক্রিয়ার প্রতিটি এবং তাদের সঙ্গে যুক্ত উপনির্ধারকগুলি কোন না কোন ভাবে জনসংখ্যার সঙ্গে সম্পর্কিত। সেজন্য এইগুলির নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জনসংখ্যাও নিয়ন্ত্রিত হয়। আংশিকভাবে বিপরীতটাও সত্যি।

অন্যদিকে অস্তিত্ব সহায়ক বিকাশ এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি যা বিকাশ প্রক্রিয়া এবং পরিবেশের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে। বিকাশ অব্যাহত থাকে এবং পরিবেশও ধ্বংস হয় না। এই জন্য তিনটি নীতি অনুসরণ করা হয়, যথা, পরিবেশের ক্ষতিকারক বিষয়গুলি চিহ্নিতকরণ, বিকাশের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক বিষয়গুলি চিহ্নিতকরণ এবং উপযুক্ত কৌশল গ্রহণ করা। এই প্রসঙ্গে চতুর্থ নীতিটি হল সর্বস্তরে জন সাধারণের অংশগ্রহণ। প্রতিরোধমূলক ও প্রতিকারমূলক এই দুই প্রকার কৌশল গ্রহণের প্রয়োজন হয়। জনসাধারণের অংশগ্রহণ ব্যতীত অস্তিত্ব সহায়ক বিকাশ সম্ভব নয়।

স্বাস্থ্য জনসংখ্যার সঙ্গে এবং জীবনযাপনের মানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত একটি উপাদান। স্বাস্থ্যের নির্ধারক বিষয় পাঁচটি, যথা, জৈবিক তথা জেনেটিক গঠন, পরিবেশ, জীবনশৈলী, আর্থসামাজিক অবস্থা এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্য পরিসেবা। অপরপক্ষে স্বাস্থ্যের মান নির্ধারিত হয় অনেক প্রকার সূচকের সমন্বয়ে। যেমন, মৃত্যু বিষয়ক, রোগ সম্ভাবনার সূচক, পুষ্টিজনিত সূচক, স্বাস্থ্য পরিসেবার সূচক, সদ্ব্যবহারের হার, সামাজিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের সূচক ও আর্থ সামাজিক সূচক।

জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, এবং ভবিষ্যৎ জীবনের মানোন্নয়নের উদ্দেশ্য প্রথমে যৌন শিক্ষা পরে যথাক্রমে কৈশোরের শিক্ষা এবং পারিবারিক জীবন সম্পর্কিত শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা হলেও প্রথম দুটি কার্যকর হয়নি। কিছুটা ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাপকতর পটভূমিকায় পারিবারিক জীবন সম্পর্কিত শিক্ষা সম্প্রতি প্রবর্তন করা হয়েছে। এদের মূল উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের সুস্থ যৌনজীবন ও পারিবারিক জীবনের জন্য প্রস্তুত করা এবং সেই সঙ্গে যৌনতা বাহিত রোগ প্রতিরোধ ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলা।

৩.১০ অনুশীলনী

1. অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Very Short Answer Questions)

(ক) কখন একজন মানুষ সম্পদ হিসাবে গণ্য হয়?

(খ) সঞ্চিত অর্থের সম্পদমূল্য কম কেন?

(গ) পারিবারিক বরাদ্দের প্রকৃষ্ট নীতি কী?

(ঘ) সামাজিক ভেদাভেদের সঙ্গে জীবনযাপনের মানের সম্পর্ক কী?

(ঙ) অস্তিত্ব সহায়ক বিকাশ কাকে বলে?

(চ) প্রতিরোধমূলক কৌশল কী?

(ছ) স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা কী?

(জ) আর্থ সামাজিক অবস্থা স্বাস্থ্যের নির্ধারক কেন?

(ঝ) স্বাস্থ্যের পুষ্টিজনিত সূচকগুলি কী কী?

(ঞ) কৈশোরের শিক্ষার দুটি উদ্দেশ্য লিখুন।

2. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Short Answer Questions)

(ক) সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে জীবনযাপনের মানের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।

(খ) অস্তিত্ব সহায়ক বিকাশের ধারণার উৎপত্তি ও অর্থ ব্যাখ্যা করুন।

(গ) পরিবেশের ক্ষতিকারক বিষয়গুলি চিহ্নিত করা প্রয়োজন কেন? উদাহরণ দিন।

(ঘ) অস্তিত্ব সহায়ক বিকাশের জন্য জনসাধারণের অংশগ্রহণ আবশ্যিক কেন?

(ঙ) স্বাস্থ্যের নির্ধারক হিসাবে পরিবেশ ও জেনটিক গঠনের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।

(চ) স্বাস্থ্যের মান হিসাবে মৃত্যু বিষয়ক এবং রোগ সম্ভাবনার সূচকগুলি কী কী?

(ছ) যৌন শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি লিখুন। এর ব্যর্থতার কারণ কি?

3. রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay Questions)

(ক) জীবনযাত্রার মান নির্ধারক উপাদানগুলি আলোচনা করুন।

(খ) অস্তিত্ব সহায়ক বিকাশের নীতিগুলি উদাহরণ সহ আলোচনা করুন।

(গ) স্বাস্থ্যের নির্ধারকগুলি কী কী? প্রত্যেকটি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) স্বাস্থ্যের মান নির্ণয়ের সূচকগুলি উল্লেখ করুন।

(ঙ) যৌন শিক্ষা, কৈশোরের শিক্ষা এবং পারিবারিক জীবন সম্পর্কিত শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিন।

একক ৪ ❑ জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক সম্পদ (Population and Natural Resource)

গঠন (Structure)

৪.১ সূচনা

৪.২ উদ্দেশ্য

৪.৩ সম্পদের প্রকারভেদ

৪.৩.১ অপূরণযোগ্য সম্পদ

৪.৩.২ পূরণযোগ্য সম্পদ

৪.৪ প্রতিকার

৪.৪.১ সম্পদের সংরক্ষণ

৪.৪.২ সম্পদের পুনর্ব্যবহার

৪.৫ সারসংক্ষেপ

৪.৬ অনুশীলনী

৪.১ সূচনা (Introduction)

জনসংখ্যার সঙ্গে সম্পদের সম্পর্কের ধারণা দিতে যেয়ে যে পাঁচ প্রকার সম্পদের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে প্রধানতম ও মৌলিক হল প্রাকৃতিক সম্পদ। সভ্যতার আদিকাল থেকেই মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভর করে এসেছে। কৃষিকাজ শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত আদিম মানুষকে সেই কারণেই যাযাবর জীবনযাপন করতে হয়েছে। এক স্থানের সম্পদ শেষ হয়ে গেলে সংরক্ষণের তাগিদে সেখান থেকে সরে যেয়ে আবার একটি নির্দিষ্ট সময়ে সেখানে ফিরে এসেছে তারা। কিছুকাল আগেও আন্দামানের ওঙ্গি নামক উপজাতিরা সারা বছরে সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল দিয়ে তাদের বাসস্থান দ্বীপকে চক্রাকারে প্রদক্ষিণ করত। কারণ তাদের কৃষিকাজ জানা ছিল না। সমুদ্রের মাছ শিকার আর বনজ সম্পদ সংগ্রহ এই ছিল তাদের বেঁচে থাকার উপায়। কিন্তু বনজ সম্পদ সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে তারা তাদের নিজেদের মত করে সচেতন ছিল।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আদিম সংরক্ষণের রীতি ক্রমশ হারিয়ে গেছে। তাছাড়া অতিরিক্ত লোভ, আরাম বিলাস, অপরিমিত চাহিদার জন্য নির্বিচারে সম্পদ ধ্বংস করতে করতে তারা নিজেরাই নিজেদের বিপদ ডেকে এনেছে। সেজন্য প্রত্যেক মানুষেরই এখন জানা দরকার প্রাকৃতিক সম্পদের বর্তমান অবস্থা কী? তার জন্য কোন কোন বিপদ হতে পারে। সেইসঙ্গে জানা দরকার সম্পদের সংরক্ষণ ও পুনর্ব্যবহারের গুরুত্ব ও সম্ভাব্য উপায়গুলি কী কী। বর্তমান এককে এই বিষয়টি সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া হবে। কিন্তু কোন পরিমাপ বা

পরিসংখ্যান দেওয়া হয়নি। কারণ পরিসংখ্যাগুলির চেয়েও কার্যকর তথ্য বর্ণনা করে শুধুমাত্র বিষয়টি সম্বন্ধে সচেতন করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। আগ্রহীরা পরিসংখ্যানের জন্য সকলের শেষে দেওয়া গ্রন্থপঞ্জি থেকে নির্বাচিত বইগুলি দেখতে পারেন।

৪.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

- সম্পদের প্রকারভেদ করতে পারবেন।
- পূরণযোগ্য ও অপূরণযোগ্য সম্পদের পার্থক্য বলতে পারবেন।
- সম্পদ ধ্বংসের কারণ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রতিকার হিসাবে সম্পদের সংরক্ষণ পদ্ধতিগুলি বলতে পারবেন।
- সম্পদের পুণর্ব্যবহারের পদ্ধতি বলতে পারবেন।

৪.৩ সম্পদের প্রকারভেদ (Types of Resource)

যে সমস্ত উপাদান মানুষের চাহিদা ও সামাজিক লক্ষ্য পূরণের জন্য ব্যবহৃত হয় সেগুলিকে সম্পদ এই সাধারণ নামে অভিহিত করা হয়। সুতরাং কোন বস্তুর সম্পদমূল্য নির্ভর করে তার ব্যবহার যোগ্যতার উপর। সহজ লভ্যতা ও প্রাচুর্য সম্পদের মূল্য কমায়। ইতিপূর্বে জীবনযাত্রার মান প্রসঙ্গে পাঁচ প্রকার সম্পদের কথা বলা হয়েছে, যথা, মানব সম্পদ, খাদ্য, ধন, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং প্রযুক্তি। এর মধ্যে ধন বা অর্থনৈতিক সম্পদ মানুষের প্রয়োজনে সৃষ্ট কৃত্রিম সম্পদ। সঠিক অর্থে সমস্ত সম্পদই প্রাকৃতিক সম্পদ। প্রাকৃতিক সম্পদের উপরই মানব সভ্যতার বিকাশ ও বিনাশ নির্ভরশীল। জনসংখ্যার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে প্রাকৃতিক সম্পদেরই সম্পর্ক। সেজন্য এখানে প্রধান আলোচ্য বিষয় প্রাকৃতিক সম্পদের বিষয়টি। প্রাথমিক ভাবে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার যে সম্পদের একটি বৃহত্তর অংশ ব্যয়করা হয় শক্তি উৎপাদনের জন্য। এমন কি যে খাদ্য আমরা গ্রহণ করি তার প্রধান অংশই ব্যয়িত হয় শরীরে তাপশক্তি উৎপাদনের জন্য। পুষ্টির উপাদানগুলি শরীরের প্রতিটি উপাঙ্গকে সবল রাখার জন্য শক্তি যোগায়। সম্পদ শক্তি উৎপাদন করায় ব্যয়িত হোক বা অন্য কাজে লাগুক সবসময়ই তার রূপান্তর ঘটে। অপরিবর্তিত অবস্থায় সম্পদ সমস্ত চাহিদা মেটাতে পারে না। সেজন্য মানুষ নানাভাবে সম্পদের রূপান্তর ঘটায় কিন্তু কখনও নতুন সম্পদ সৃষ্টি করতে পারে না। মানুষ একটি চালের দানাও তৈরি করতে পারে না। অনেক চরম প্রকৃতিবাদী মনে করেন সূর্যই একমাত্র শক্তি যা সম্পদ সৃষ্টি করতে পারে।

সুতরাং মানুষের কাজ সম্পদের রূপান্তর ঘটানো এবং সম্পদ ধ্বংস করা অনেক ক্ষেত্রে সম্পদ উৎপাদন করা, কিন্তু সৃষ্টি করা নয়। চারিত্রিক বিশেষত্ব অনুযায়ী সম্পদকে অনেক রকমভাবে শ্রেণি বিভাগ করা যায়। জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে তার সবকিছু প্রয়োজনীয় নয়।

যে সম্পদ একবার ব্যবহারের পর আর ব্যবহার করা যায় না তাকে বলা হয় অপূরণযোগ্য সম্পদ। যেমন, খনিজ সম্পদ। কয়লা, পেট্রোল ইত্যাদি সম্পদ উত্তম শক্তির উৎস কিন্তু তার ভাণ্ডার সীমিত এবং ক্ষয়িষ্ণু। অপরদিকে জল, বাতাস প্রভৃতি বার বার ব্যবহার করা যায় কারণ, নানাভাবে সেগুলি আবার ফিরে আসে, সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় না। এগুলি পূরণযোগ্য সম্পদ। পূরণযোগ্য সম্পদ (Renewable Resource) ও অপূরণযোগ্য সম্পদ (Nonrenewable resource) দুই-ই সম্পদ হিসাবে ব্যবহৃত হলেও একটি আর একটির পরিপূরক নয়।

৪.৩.১ অপূরণযোগ্য সম্পদ (Non renewable resource)

এখানে প্রধানভাবে খনিজ সম্পদের কথাই বলা প্রয়োজন। খনিজ সম্পদ প্রাকৃতিক ভাবেই ভূগর্ভে সঞ্চিত আছে কিন্তু তার তার নতুন করে তৈরি হচ্ছে না। বা হবে না। সঞ্চিত অর্থ যেমন একদিন শেষ হয়ে যায় তেমনি ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে খনিজ সম্পদের ভাণ্ডার ক্রমশ কমে আসছে। ধাতুগুলির মধ্যে তামা ও নিকেল প্রায় নিঃশেষিত। সেজন্য তামা ও নিকেলের ব্যবহার খুবই কমানো হয়েছে। কয়লা ও পেট্রোলিয়ামও অদূর ভবিষ্যতে শেষ হয়ে যাবে। সেজন্য বিকল্প শক্তির উৎস নিয়ে প্রচুর গবেষণা হচ্ছে।

পেট্রোলিয়াম (Petroleum) : পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসের পরিমাণ যথাক্রমে 50 কোটি টন ও 500 বিলিয়ন ঘন মিটার (আনুমানিক)। প্রাকৃতিক গ্যাসের ভাণ্ডার আপাততত সন্তোষজনক হলেও পেট্রোলিয়ামের চাহিদা অনুযায়ী মজুতের পরিমাণ খুবই কম। সেজন্য পেট্রোলিয়াম আমদানির দরুণ আমাদের অর্থনীতির উপর সব সময়ই চাপ বজায় থাকে।

কয়লা (Coal) : জিওলজিক্যাল সার্ভের তথ্য অনুযায়ী আমাদের দেশে যত মজুত কয়লার ভাণ্ডার আছে তার অনেকটাই উত্তোলন করা যাবে না। সুতরাং সম্পদ হিসাবে তার মূল্য নেই। যে হারে বর্তমানে কয়লা উত্তোলন করা হয় তার দরুণ অদূর ভবিষ্যতে কয়লার সঙ্কট দেখা দেবে। কয়লার একটা বড় অংশ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজন হয়। কয়লার দূষণ ক্ষমতা বেশি হওয়ায় গৃহস্থালীতে কয়লার ব্যবহার যথা সম্ভব কমানোর চেষ্টা চলছে। কিন্তু সকলের কাছে এখনও প্রাকৃতিক গ্যাস বা কয়লা থেকে উৎপন্ন গ্যাস (Coal gas) পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়নি।

৪.৩.২. পূরণযোগ্য সম্পদ (Renwable Resource)

পূরণযোগ্য সম্পদের একটি বড় অংশ কৃষিজ ও বনজ সম্পদ। কিন্তু সমস্যা এই যে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে প্রতি বৎসরই খাদ্য উৎপাদন বাড়িয়ে চলতে হচ্ছে। প্রাথমিক ভাবে কৃষি জমি উদ্ধার করে কৃষি জমি বাড়িয়ে অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদনের যে ব্যবস্থা হয়েছে তার তিনটি প্রকারভেদ আছে,

বন ধ্বংস করে কৃষি জমিতে রূপান্তরিত করা।

সেচের সাহায্যে পতিত অনুর্বর জমি উদ্ধার।

নদী, জলাভূমি ইত্যাদি ভরাট করে কৃষি জমিতে রূপান্তরিত করা।

এর মধ্যে দ্বিতীয়টি ছাড়া বাকি দুটি ক্ষেত্রেই প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নতুন বসতি স্থাপন, কলকারখানার প্রসার ও অন্যান্য কারণে কিছু কিছু কৃষিজমির রূপান্তর ঘটায় বনজ সম্পদের উপর আক্রমণ হয় সবচেয়ে বেশি। এছাড়াও নানা কাজে কাঠের ব্যবহার, জ্বালানি হিসাবে কাঠের ব্যবহার বন ধ্বংস হওয়ার অন্যতম কারণ।

অরণ্য (Forest) : অরণ্য ধ্বংস হওয়ার ফলে শুধুমাত্র সম্পদের পরিমাণ প্রত্যক্ষভাবে কমে তাই নয় আরও কিছু কিছু সমস্যা দেখা দেয়।

বন্যপ্রাণীর খাদ্য শৃংখল বিপর্যস্ত হয় এবং পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়। বনের মধ্যস্থিত তৃণজাতীয় উদ্ভিদ তৃণভোজী (হরিণ ইত্যাদি) প্রাণীদের আহার যোগায় এবং অনেক প্রাণীর আশ্রয়স্থল হিসাবে কাজ করে। কিন্তু মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে তৃণভূমি দখল করে নিলে অথবা ব্যবহারের জন্য অধিকাংশ তৃণজাতীয় উদ্ভিদ কেটে নিলে তৃণভোজী প্রাণীর সংখ্যা কমে যায়। এর ফলে বাঘ জাতীয় প্রাণিদের বিলোপ ঘটে। ভারতে বাঘের সংখ্যা বিপজ্জনক ভাবে কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ এটাই। মাঝে মাঝেই বন্য হাতির দল লোকালয়ে এসে ফসল খেয়ে যায় এবং বাড়ি ঘর ভেঙ্গে দিয়ে যায় তার কারণ বসতি ও অরণ্যের মধ্যে কোন দূরত্ব নেই। যা একদিন হাতিদের বিচরণভূমি ছিল, সেগুলি কৃষি জমিতে রূপান্তরিত হয়।

অরণ্যকে রক্ষা করে অরণ্যবাসী জনগোষ্ঠীর জীবিকার প্রয়োজন অনেকটাই মেটে। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এবং অরণ্য সঙ্কুচিত হওয়ার ফলে অরণ্যজাত নানা দ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণ বাড়তে পারে না। অতিরিক্ত চাপর জন্য একদিকে যেমন অরণ্যের চরিত্র নষ্ট হয় অন্যদিকে বনবাসী জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক সমস্যা বৃদ্ধি পায়। ভারতে এর নজির অসংখ্য।

আবহাওয়ার পরিবর্তন অরণ্য সম্পদ নষ্ট হওয়ার অন্যতম কারণ। অনাবৃষ্টি, ভূমিক্ষয়, বন্যা ইত্যাদি নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রধান কারণ নির্বিচারে বৃক্ষচ্ছেদন, একথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু এর ফলে কৃষি সম্পদ ধ্বংস হয়ে বিপর্যয় ডেকে আনে। অনাবৃষ্টি বা বন্যার ফলে শুধুমাত্র যে স্থানীয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাই নয়, দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির উপর তার দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব পড়ে। অর্থাৎ পুরণযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ অর্থনৈতিক সম্পদের প্রধান নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি হয়ে দাঁড়ায়। ভারতে বৃষ্টির পরিমাণ কম বেশি হওয়ার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন ভোগ্যপণ্যের দামের ওঠা নামা। এক অঞ্চলের ফসল নষ্ট হলে সারা দেশে তার প্রভাব পড়ে।

অরণ্যের সংকোচন সহজ অধিগম্যতর ফলে এক শ্রেণির মানুষ নিজেদের স্বার্থে চোরাশিকার ও কাঠচুরি করে অরণ্যের আরও ক্ষতি সাধন করছে। এর ফলে প্রায় নিঃশব্দে অরণের গভীরে পরির্তন ঘটে চলেছে যার ফল অত্যন্ত সুদুরপ্রসারি ও বহুমুখী।

কৃষি (Agriculture)

কৃষির ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাবে খাদ্যের প্রয়োজন বৃদ্ধি পাওয়ার কথা একবার উল্লেখ করা হয়েছে। অরণ্য ধ্বংসের পরিপ্রেক্ষিতে কৃষিজমি বাড়ানোর কথাও বলা হয়েছে। এ ছাড়াও আরও কিছু কিছু সমস্যার কথা বলা প্রয়োজন।

1960-এর দশকে কৃষি বিপ্লব সম্ভব হয়েছিল স্বামীনাথন প্রমুখ বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত গবেষণার ফলে। উচ্চ ফলনশীল ধান ও অন্যান্য ফসল বীজ তৈরি করে সেই সময় তাঁরা ভারতকে খাদ্য সংকটের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু ঐসব ফসলের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ছিল খুবই কম। ফসল রক্ষার জন্য নানা রাসায়নিক সারও কীটনাশকের ব্যবহার ছিল অপরিহার্য। এর ফলে ক্ষতিকর কীট পতঙ্গের সঙ্গে উপকারী কীট পতঙ্গও একই সঙ্গে ধ্বংস হয়ে যেত। কীটনাশকের প্রভাবে পাখিদের মৃত্যু হতে থাকে প্রচুর সংখ্যায়, কারণ তাদের খাদ্য ছিল ঐসব কীটপতঙ্গ। তাছাড়াও কীটনাশক রাসায়নিকগুলির কঠিন শৃংখল এমনই যে সেগুলি কখনই রাসায়নিক

গুণ নষ্ট হয় না, অর্থাৎ অনুর গঠন কখনই ভাঙ্গে না। এই সাব রাসায়নিক জলবাহিত হয়ে নদী ও অন্যান্য জলাশয়ে জমা হওয়ায় জলজ উদ্ভিদ ও মাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকল। এই বিপর্যয়ের জন্য অন্য ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ বিনষ্ট হতে হতে বহু পাখি, মাছ, জলজ প্রাণি এখন প্রায় বিলুপ্তির মুখে।

অপরিকল্পিত চাষ, অর্থাৎ চাষীরা নিজেদের জমিতে পছন্দ মত ফসল চাষ করায় কখনও কখনও অতিরিক্ত অপ্রয়োজনীয় ফলন এবং অপ্রতুল প্রয়োজনীয় ফলন হওয়ার ফলে ফসলের সম্পদমূল্য যথাযথ হয় না, জনসংখ্যার সঙ্গে বিষয়টি এই কারণে যুক্ত যে বৃহৎ পরিবারের ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনই প্রধান। তাদের পক্ষে পরিকল্পনা করার চেয়েও বড় প্রশ্ন গত বছর কোন ফসলের বাজার দর কেমন ছিল বা কোনটা বেশি লাভজনক হতে পারে। ছোট পরিবারের আর্থিক সহনশীলতা বেশি হওয়ায় তারা অপেক্ষা করতে পারে।

সেচের সুযোগ সর্বত্র না থাকার জন্য কৃষিকাজের জল তোলা হয় ভূগর্ভস্থ জলস্তর থেকে। শীতকাল ও গ্রীষ্মকালের অনাবৃষ্টি বা কম বৃষ্টির সময় জলস্তর নেমে যায় অনেক নিচে। গ্রামের পুকুর, খাল, বিল শুকিয়ে যায় সহজেই। নলকূপে পানীয় জল পাওয়া যায় না। জল সম্পদের অভাবে স্বাস্থ্যহানি ঘটে বিপুল সংখ্যক মানুষের।

জলস্তর নিচে নেমে যাওয়ার আর একটি ভয়াবহ পরিণতি মাটির থাকা আর্সেনিক যৌগের রাসায়নিক পরিবর্তন। পরিবর্তিত রাসায়নিক যৌগ জলে অদ্রবণীয় অবস্থা থেকে দ্রবণীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয়ে জলের সঙ্গে মিশে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষের মারাত্মক স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়েছে।

অরণ্য ও কৃষি সম্পর্কিত সমস্যাগুলি অনেক। তার কয়েকটি নমুনা এখানে তুলে ধরা হল। এখন কয়েকটি প্রতিকারের কথা বলা দরকার।

৪.৪ প্রতিকার (Remedies)

নীতিগতভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের হ্রাস রোধ করার দুটি দিক আছে। একটি দিক প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ ও অপরটি পুনর্ব্যবহার। সংরক্ষণ কথাটিতে কোন সম্পদ ব্যবহার না করার একটি ইঙ্গিত আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সংরক্ষণ অর্থ সম্পদের ব্যবহার বন্ধ করা নয়, নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার ও পুনরুৎপাদন করে স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখা। অন্যদিকে পুনর্ব্যবহার করার অর্থ কোন সম্পদ একবার ব্যবহার করা হয়ে গেলে তার যে রূপান্তর ঘটে, সেই রূপান্তরিত বস্তুকে অন্যভাবে ব্যবহার করা।

৪.৪.১. সম্পদের সংরক্ষণ (Conservation of Resources)

পরিকল্পিতভাবে সম্পদ যদি এমনভাবে বণ্টন করা যায় যে যতটুকু প্রয়োজন তার বেশি ব্যবহার করা না হয় এবং যতটা সম্পদ ব্যয়িত হল তার পরিবর্তে নতুন সম্পদ সৃষ্টি করা হয় তবে তাকে বলা হয় **সম্পদের সংরক্ষণ (Conservation of Resource)**। এখানে সংরক্ষণের কয়েকটি উপায় উল্লেখ করা হল। জনসংখ্যা শিক্ষায় বিষয়গুলি ছাত্রছাত্রীদের সামনে তুলে ধরলে, তারা প্রথম থেকেই সংযত হতে শিখবে এবং সম্পদ সংরক্ষণে তৎপর হবে।

অরণ্য সম্পদ (Forest Resoure) : অরণ্য সংরক্ষণের জন্য প্রধানতম পদক্ষেপ যতটুকু বনাঞ্চল আছে তাকে

আর কোনভাবেই সঙ্কুচিত হতে না দেওয়া। এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র আইনের সাহায্যে অরণ্য সংরক্ষণ করা যাবে না, সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। অন্যান্য যে সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া দরকার তার কয়েকটি নিম্নরূপ—

(১) কাঠের ব্যবহার যথাসম্ভব কমিয়ে বিকল্প বস্তুর ব্যবহার। বর্তমানে ঘরের দরজা জানালা, গ্রামে কাঠের খুঁটি, আসবাব পত্র এবং জ্বালানি হিসাবে কাঠের ব্যবহার সর্বাধিক। জ্বালানির প্রসঙ্গটি তাপশক্তি প্রসঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হবে। শহরাঞ্চলে দরজা জানালায় লোহা, এলুমিনিয়াম, কাচ ইত্যাদির ব্যাপক ব্যবহার করা হচ্ছে। আসবাব পত্রের ক্ষেত্রেও, লোহা, মোল্ডেড প্লাস্টিক ইত্যাদির ব্যবহারে মানুষ অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। তবে কাঠের দরজা জানালা, আসবাব এখনও বহু মানুষের কাছে সামাজিক মর্যাদার প্রতীক সেজন্য কাঠের ব্যবহার এখনও কম নয়। তাছাড়াও কাঠের কিছু বিশেষ সুবিধা আছে যা অন্য কিছুতে পাওয়া যায় না। এটাও অন্যতম কারণ।

(২) যতটা অরণ্যের ক্ষতি হয় তার জন্য নতুন অরণ্য সৃজন করা দরকার। বনে স্বাভাবিক নিয়মে অনেক গাছের মৃত্যু ঘটে। কিছু কিছু গাছ কেটে নেওয়ার দরকার হয়। তার পরিবর্তে নতুন চারাগাছ রোপণ করা এবং তাকে বাড়িয়ে রাখা দরকার। এর পাশাপাশি **সামাজিক বনসৃজন (Social Forestry)**, নাগরিক ও দৃষ্টি নন্দন বনসৃজন (Urban and landscape forestry), ঔষধি ও অর্থনৈতিক বনসৃজন (Medicinal and Economic forestry) ইত্যাদির মাধ্যমে অরণ্য সম্পদ রক্ষা ও অর্থনৈতিক সম্পদ সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। সামাজিক বনসৃজন কথাটির অর্থ লোকালয়ে, চাষের জমির ফাঁকে ফাঁকে। পতিত জমিতে যেখানে সম্ভব সেখানেই গাছ লাগিয়ে বড় করে তোলা। মনে রাখতে হবে আমাদের দেশে বৃক্ষরোপণের চেয়েও তাকে লালন পালন করায় অবহেলা বেশি। নাগরিক ও দৃস্টিনন্দন বনসৃজন করে শহরের পথ, পার্ক, প্রতিষ্ঠান এগুলিকে সাজিয়ে তোলা যায়। এর ফলে একদিকে পরিবেশ রক্ষা পায়, শহরের ধূলো ধোঁয়ার হাত থেকে কিছুটা পরিত্রাণ পাওয়া যায় আবার সৌন্দর্য বৃদ্ধিও হয়, যা মানুষের আনন্দের কারণ। ঔষধের গাছ, ফলের গাছ, রবার বা অনুরূপ যে সমস্ত গাছ থেকে সরাসরি অর্থ উপার্জন করা যায় সেই সব গাছ এখন নানা জায়গায় লালন করা হয়। তাছাড়াও নতুন চারা তৈরি, বৃক্ষ রোপণ, তার রক্ষণাবেক্ষণ এই সব কাজে বহু লোকের কর্মসংস্থান হতে পারে, যা সামগ্রিকভাবে স্থানীয় মানুষের জীবন যাপনের মান উন্নত করতে পারবে।

(৩) বনচর জনগোষ্ঠীর বিকল্প জীবিকা অবলম্বন করা দরকার। তাদের স্বাভাবিক বাসভূমি ছেড়ে অন্যত্র না পেয়ে অরণ্য নির্ভর জীবিকার সংস্থান করা সম্ভব। কোন কোন জায়গায় (আসামের মানস অরণ্যে) দেখা গেছে যারা অন্যকোন জীবিকা না থাকায় চোরাশিকারি ও কাঠচোরদের সহযোগী হিসাবে কাজ করছিল সেই সব মানুষ এখন অরণ্যরক্ষী হিসাবে সবচেয়ে বড় সম্পদে পরিণত হয়েছে। এতে সরকারের ব্যয় কম কিন্তু অরণ্য সন্নিহিত অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেছে।

কৃষি সম্পদ (Agricultural Resource) : কৃষি সম্পদ পূরণযোগ্য (Renewable)। কৃষির উন্নয়ন ও প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদনের জন্য প্রথমেই দরকার দেশের সমস্ত কর্ষণযোগ্য জমিকে চাষের কাজে ব্যবহার করা। সেই সঙ্গে আরও কয়েকটি পদক্ষেপ আবশ্যিক।

(১) জমির প্রকৃতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্য জানার উদ্যোগ নেওয়া দরকার। অনেক জমিতেই ফসলের পরিবর্তন করে আরও বেশি ফলন পাওয়া যেতে পারে। তার জন্য মাটি সম্বন্ধে সঠিক তথ্য।

(২) পর্যায়ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন ফসল (Rotational Cultivation) চাষ করলে মাটির উর্বরতা ও ফসলের চাহিদা

ও মূল্যমান বজায় থাকতে পারে। তার জন্য কৃষিনির্ভর জনগোষ্ঠীর প্রশিক্ষণ দরকার এবং প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপকরণ সরবরাহ করা দরকার। অন্যভাবে একেই বলা হয়েছে পরিকল্পিত চাষ। কৃষি বিজ্ঞানীরা অনেকেই এই সম্ভাবনার বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন।

(৩) যথা সম্ভব জৈব সার ব্যবহার করে মাটির উর্বরতা ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন। মাথাপিছু যে পরিমাণ বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশিত হয় তার সঠিক রূপান্তর ঘটিয়ে (Waste management) সার হিসাবে ব্যবহারের প্রক্রিয়া আরও ব্যাপকভাবে প্রচলিত করা দরকার। এর ফলে দুই দিক থেকেই লাভ, জঞ্জাল থেকে মুক্তি ও উন্নত মানের ফসল। সারা বিশ্বে জৈবসার থেকে উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে এখনও পর্যন্ত জৈব সার প্রয়োগ করে উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বেশি হওয়ায় তা সকলের আয়ত্বের মধ্যে নেই।

(৪) **জৈব প্রযুক্তি (Bio-technology)** যার অন্যতম জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, টিসু কালচার, ক্লোনিং (Genetic engineering, Tissue Culture, Cloning) ইত্যাদি নতুন ধরনের বীজ ও ফসল উৎপন্ন করতে সক্ষম। জৈব প্রযুক্তির সাহায্যে ফসলের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো সম্ভব, একই ফসলের মধ্যে একাধিক খাদ্যগুণ সঞ্চার করা সম্ভব এবং খাদ্য বৃদ্ধি করাও সম্ভব। এর ফলে কীটনাশকের প্রয়োজন কমবে এবং সামগ্রিকভাবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা পাবে। তবে জৈব প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার এখনও পরীক্ষা নিরীক্ষার স্তরে আছে। তার সব ভালোমন্দ এখনও জানা যায়নি।

(৫) কৃষিপণ্যের সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ (Processing), বিপণন এবং বণ্টনের ক্ষেত্রে কৃষক বান্ধব ব্যবস্থা প্রবর্তন করা দরকার। না হলে কৃষকের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা সম্ভব নয়।

(৬) সর্বত্র ভূমি সংস্কার অবিলম্বে প্রয়োজন। এর ফলে কৃষকের ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে, ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

শক্তি (Energy) : প্রাকৃতিক সম্পদের একটি বড় অংশ শুধুমাত্র তাপশক্তি উৎপাদনের জন্য ব্যয় করা হয়। আগুন জ্বালাতে শেখার পর মানব সভ্যতার দ্রুত উন্নতি ঘটতে থাকে এবং তাপের চাহিদা ক্রমশ বাড়তে থাকে। বর্তমান পৃথিবীতে পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় অনগ্রসর বা অগ্রসরমান দেশগুলিতে অনেক তাপশক্তি কম খরচ হয়। তবে জনসংখ্যার দরুণ মোট তাপশক্তির চাহিদা এইসব দেশেও বিপুল। কয়লা ও পেট্রোলিয়ামের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। কাঠ, কয়লা এবং পেট্রোলিয়াম মিলিতভাবে দীর্ঘকাল তাপশক্তির মূল উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। পরবর্তীকালে জলবিদ্যুৎ অনেকটা স্থান দখল করেছে।

কয়লা থেকে তাপবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় ও বয়লার ইত্যাদিতে কয়লার ব্যবহার বহুল প্রচলিত। কিন্তু কয়লার বর্জ্য পদার্থের পরিমাণ অনেক। এর ফলে বায়ু জল, মাটি সবই দূষিত হয়। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির আশেপাশে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চিমনি নিসৃত উড়ন্ত ছাই (Fly ash) একটি বিপর্যয় সৃষ্টিকারী দূষণের উপাদান। কাঠ অরণ্য ধ্বংসের কারণ, পেট্রোলিয়াম বায়ুদূষণের প্রধান কারণ। এই অবস্থায় যে সমস্ত প্রতিকার সম্ভব তার মধ্যে প্রধানতম হল বিকল্প শক্তির উৎস সন্ধান। কয়লা ইত্যাদি অপূরণযোগ্য শক্তির স্থানে পূরণযোগ্য শক্তির ব্যবহারই একমাত্র বিকল্প।

(১) **জৈব ডিজেল (Bio diesel) :** Jatrofa জাতীয় উদ্ভিদ নিসৃত তেল পরিশ্রুত করে ডিজেলের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করার পরীক্ষা এখন সফল। পরিত্যক্ত জমিতে বা সামাজিক বনসৃজনের মধ্যে Jatrofa চাষ করা খুবই সহজ। এর ফলে অনেক কম খরচে বিকল্প জ্বালানি তেলের ব্যবহার পরিবেশ দূষণ ও অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। চাষিও উপকৃত হবে।

(২) **হাইড্রোজেন (Hydrogen) :** হাইড্রোজেন দাহ্য গ্যাস। জল থেকে হাইড্রোজেন গ্যাস আলাদা করে নিয়ে তাকে জ্বালানি হিসাবে গাড়ি চালানের জন্য ব্যবহার করার পরীক্ষাও সফল। এর জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। এখন শুধু ব্যাপক হারে এর প্রয়োগের অপেক্ষা।

(৩) **সৌর শক্তি (Solar energy) :** সূর্য অসীম শক্তির আধার। আমাদের দেশ বছরের অধিকাংশ সময় অকৃপণ ভাবে সূর্যের আলো পেয়ে থাকে। সেজন্য বহুদিন ধরেই সৌর শক্তিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা হয়ে আসছে। Solar cookes, Solar Heater. Solar Torch ইত্যাদি নির্মিত হয়েছে যা সৌর শক্তিতে কাজ করে এবং বর্তমানে সহজলভ্য। এছাড়াও সৌরশক্তিকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে লাগানোর জন্য Photovoltaic technology ব্যবহার করা হচ্ছে। বিশেষভাবে নির্মিত সিলিকন কোশ সরাসরি সৌরশক্তিকে বিদ্যুতে রূপান্তরিত করে। অনেকগুলি কোষের প্যানেল যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে তার সাহায্যে একটি গোটা গ্রামের আলো, পাখা, টেলিভিশন চলতে পারে। দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে, পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলের দ্বীপগুলিতে এইভাবেই বিদ্যুতের ব্যবস্থা হয়েছে। অপ্রচলিত শক্তির (Non Conventional energy) এই ব্যবহার আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত করা দরকার। তবে প্রাথমিক ভাবে এর খরচ বেশি হওয়ায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই শক্তির ব্যবহার সম্ভব নয়, সরকারি আনুকূল্যেই সম্ভব।

(৪) **জলবিদ্যুৎ (Hydro electricity) :** আমাদের দেশে সেচ ব্যবস্থা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন এই তিনটি উদ্দেশ্যে স্বাধীনতার পর থেকে অনেকগুলি নদীতে বাঁধ দিয়ে জলাধার সৃষ্টি ও জল বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়েছে। পাঞ্জাবের ভাকরা-নাঙ্গালে, বিহার পশ্চিমবঙ্গে দামোদর উপত্যকা, উড়িষ্যার হিরাকুঁদ নদীতে, গাড়োয়ালে টিহরি বাঁধ, সম্প্রতি গুজরাটে সর্দার সরোবর নামক নর্মদা নদীর বাঁধ এই রকম অনেক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই সব বাঁধ যেমন বিদ্যুৎ উৎপাদন করে সমৃদ্ধি আনতে পেরেছে তেমনি নানা বিপর্যয় ডেকে এনেছে। অরণ্য ধ্বংস, কৃত্রিম বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি নানান প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণ বাঁধগুলি। বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী এর ফলে বাস্তুচ্যুত হয়ে জনারণ্যে হারিয়ে গেছে। সেজন্য জল বিদ্যুতের পরিবর্তে অনেক কমখরচে পরিবেশ বান্ধব শক্তি উৎপাদনের চেষ্টা চলেছে। অনেক ক্ষেত্রে সফলও হয়েছে।

এরকম কয়েকটি পদ্ধতি,

(১) সমুদ্রের ঢেউ থেকে শক্তি উৎপাদন।

(২) সমুদ্রবায়ু থেকে শক্তি উৎপাদন।

(৩) গবাদি পশুর শারীরিক বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন।

(৪) পরিত্যক্ত ধাতু, প্লাস্টিক ও অন্যান্য অবিনশ্বর বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন।

এই সব উৎসগুলির এক একটিকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার করলে তাদের ক্ষমতা কম। কিন্তু এদের একত্রিত শক্তি বিপুল। মনে রাখতে হবে ভারতের তিনদিকে সমুদ্র, অবাদি পশুর সংখ্যা বিশ্বে সর্বাধিক এবং বিপুল জনসংখ্যার বর্জ্য অপরিমেয়।

৪.৪.২. সম্পদের পুনর্ব্যবহার (Recycling of resources)

ব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত সম্পদ ভিন্নভাবে আবার ব্যবহার করার নাম পুনর্ব্যবহার। এক দিক থেকে দেখতে গেলে, জল ও বায়ু থেকে শক্তি উৎপাদন করাও পুনর্ব্যবহারে কেননা এর ফলে জল বা বায়ুর স্বাভাবিক ব্যবহার ব্যাহত হয় না।

পরিত্যক্ত ধাতু ও অবিনশ্বর (Nondegradeble) বর্জ্যকে শক্তিকে রূপান্তরিত করার পুনর্ব্যবহারের নজির। আবার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উড়ন্ত ছাই থেকে ইঁট তৈরি করার প্রচেষ্টাও একটি পুনর্ব্যবহারের উদাহরণ।

ছোট বড় অনেক ক্ষেত্রে পুনর্ব্যবহারের যে সম্ভাবনা আছে তা খুঁজে দেখা দরকার এবং কাজে লাগানো দরকার। দরিদ্র মানুষ পুনর্ব্যবহারে বিশেষভাবে অভ্যস্ত। যেমন, পোড়া কয়লাকে আবার জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করার প্রথা অনেক অঞ্চলেই দেখা যায়। গৃহপালিত পশুপাখির বর্জ্যকেও তারা কাজে লাগাতে অভ্যস্ত। গাছের ঝরে পড়া পাতা অন্যতম প্রধান জ্বালানি। কিন্তু উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিলে ঐ সব বস্তুর আরও পরিবেশ বান্ধব কিন্তু মূলবান ব্যবহার সম্ভব। যেমন, গাছের পাতা না পুড়িয়ে কম্পোস্ট তৈরি করা।

সেজন্য শুধুমাত্র নতুন প্রযুক্তি নয়, গ্রামীণ জীবনের প্রথা, রীতিনীতি, জীবনযাত্রা প্রণালী, উৎসব এগুলির মধ্যে যে সব দীর্ঘকাল প্রচলিত সংরক্ষণ ও পুনর্ব্যবহার পদ্ধতি লুকিয়ে আছে সেগুলিও চিহ্নিত করা দরকার। তাহলে অনেক সহজে জনসাধারণকে সমস্ত উদ্যোগে সামিল করা যাবে।

৪.৫ সারসংক্ষেপ (Summary)

মানুষের আকাঙ্খা ও জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে যা কিছু ব্যবহৃত হয় তাকেই বলা হয় সম্পদ। সম্পদ নানারকম ভাবে শ্রেণিবিভাগ করা হয়। তার মধ্যে জনসংখ্যা ও পরিবেশ সম্পর্কিত বিষয়ে পূরণযোগ্য এবং অপূরণযোগ্য এই দুই প্রকার শ্রেণি বিভাগ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সম্পদের একটি বৃহত্তর অংশ ব্যয়িত হয় শক্তি উৎপাদনের জন্য এবং সম্পদকে কাজে লাগানোর জন্য নানাভাবে সম্পদের রূপান্তর করা প্রয়োজন হয়। যে সম্পদ একবার ব্যবহার করা হলে আর ব্যবহার করা যায় তাকে বলে অপূরণযোগ্য সম্পদ এবং যে সম্পদ বারবার ব্যবহার করা যায় অথবা আবার তৈরি করা যায় তাকে বলা হয় পূরণযোগ্য সম্পদ। কয়লা, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি জ্বালানি অপূরণযোগ্য সম্পদ। কৃষিজাত দ্রব্য, অরণ্য সম্পদ পূরণযোগ্য।

অপূরণযোগ্য সম্পদের পরিমাণ অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে প্রায় নিঃশেষ হয়ে আসছে। কয়লা, পেট্রোলিয়াম, খনিজ ধাতু ও অন্যান্য বস্তু কোনটিই অফুরন্ত নয়। সেজন্য এদের সীমিত ব্যবহার ও বিকল্প সৃষ্টি করার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। কিন্তু এসম্বন্ধে সকলের সচেতনতা ও সহযোগিতা প্রয়োজন। জনসংখ্যা শিক্ষাই এই দায়িত্ব নিতে পারে।

পূরণযোগ্য সম্পদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অরণ্য সম্পদ। অরণ্য ধ্বংস করে কৃষি ও বসত জমিতে রূপান্তরিত করে জীবকুলের ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে এবং বিশ্বউষ্ণায়ন ও আবহাওয়ার মধ্যে বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে। কৃষির ক্ষেত্রেও খাদ্যের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য রাসায়নিক সারের ব্যবহার ও কীটনাশক প্রয়োগ কৃষিজমির ক্ষতি করেছে বিপুলভাবে।

পূরণযোগ্য সম্পদের ক্ষতিরোধ করার জন্য প্রতিকার হিসাবে কয়েকটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। অরণ্য ও কৃষিজমির সংরক্ষণ, জৈব প্রযুক্তির ব্যবহার, জৈব সার ব্যবহার, খাদ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি পদ্ধতি পূরণযোগ্য সম্পদ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। শক্তির ক্ষেত্রে জৈব ডিজেল, সৌরশক্তি, বায়ু ও সমুদ্র শক্তিকে কাজে লাগিয়ে অপূরণযোগ্য সম্পদের কিছুটা সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়াও সম্পদের পুনর্ব্যবহার আর একটি বিকল্প পদ্ধতি।

৪.৬ অনুশীলনী

1. অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Very Short Answers Questions)

(ক) সম্পদ কাকে বলে?

(খ) অপূরণযোগ্য সম্পদ কাকে বলে?

(গ) অরণ্যকে পূরণযোগ্য সম্পদ বলা হয় কেন?

(ঘ) জমিতে রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফল কী?

(ঙ) কীটনাশক ব্যবহারের বিকল্প কী?

(চ) জনসংখ্যার সঙ্গে পূরণযোগ্য সম্পদের সম্পর্ক কী?

(ছ) জৈব ডিজেল কাকে বলে?

(জ) বায়ুশক্তিকে কিভাবে কাজে লাগানো যায়?

(ঝ) সামাজিক বনসৃজন কথাটির অর্থ কী?

(ঞ) বিনোদনমূলক বনসৃজন ও জীবন যাত্রার মানোন্নয়নের সম্পর্ক কী?

2. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Short Answer Questions)

(ক) পেট্রোলিয়ামের সঞ্চিত ভাণ্ডার বর্তমানে কী অবস্থায় আছে?

(খ) অপূরণযোগ্য সম্পদের মধ্যে কয়লা ও ধাতুগুলির সঞ্চয় কেন কমে আসছে?

(গ) অরণ্য ধ্বংসের কারণগুলি কী কী?

(ঘ) কৃষিজ সম্পদ কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়?

(ঙ) জৈব প্রযুক্তি কীভাবে কৃষি সমস্যাকে দূর করতে পারে?

(চ) সৌর শক্তিকে কীভাবে কাজে লাগানো হয়?

(ছ) জলবিদ্যুৎ সংক্রান্ত সমস্যাগুলি কী কী?

(জ) পরিকল্পিত চাষ কাকে বলে ব্যাখ্যা করুন।

(ঝ) ভূগর্ভস্থ জলস্তর কীভাবে নিচে নেমে যাচ্ছে? তার ফল কী?

(ঞ) সম্পদের পুনর্ব্যবহার কাকে বলে?

3. রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay Questions)

(ক) প্রাকৃতিক সম্পাদের শ্রেণিবিভাগ করুন। প্রাকৃতিক সম্পদের সঙ্গে জনসংখ্যার সম্পর্ক বিশদভাবে ব্যাখ্যা করুন।

(খ) সম্পদ ধ্বংস হওয়ার কারণগুলি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন। সম্পদ ধ্বংসের পরিণতি শেষ পর্যন্ত কী?

(গ) পূরণযোগ্য ও অপূরণযোগ্য সম্পদের সংরক্ষণ কতরকম ভাবে করা সম্ভব? প্রতিকারের পন্থাগুলি উদাহরণসহ সবিস্তারে আলোচনা করুন।

একক ৫ ❑ জনসংখ্যা শিক্ষার সংস্থা ও পাঠক্রম (Agencies of and Curriculum in Population Education)

গঠন (Structure)

৫.১ সূচনা

৫.২ উদ্দেশ্য

৫.৩ জনসংখ্যা শিক্ষার সংস্থা

৫.৩.১ প্রথাগত শিক্ষা

৫.৩.২ প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা

৫.৪ জনসংখ্যা শিক্ষার পাঠক্রম

৫.৪.১ পাঠক্রমের সমন্বয়

৫.৪.২ পাঠক্রমের সহগামিতা

৫.৫ সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী

৫.৬ পরিকল্পিত পাঠ

৫.৬.১ কয়েকটি সম্ভাব্য শিক্ষণ পদ্ধতি

৫.৭ সারসংক্ষেপ

৫.৮ অনুশীলনী

৫.৯ গ্রন্থপঞ্জি

৫.১ সূচনা (Introduction)

পূর্ববর্তী চারটি এককে জনসংখ্যার সঙ্গে যুক্তি বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হয়েছে। বিদ্যালয় স্তর থেকে জনসংখ্যার সমস্যা সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তাও কিছুটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু বিদ্যালয় পাঠক্রমে জনসংখ্যার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হলে যে প্রশ্নগুলি প্রথমেই উঠে আসে তার মধ্যে আছে, বিষয়টি কোথায় কোন স্তরে পড়ানো হবে, পাঠক্রমে জনশিক্ষার বিষয়টি কোথায় স্থান পাবে, পাঠ পদ্ধতিই বা কি হবে। এই সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য বর্তমান এককটির অবতারণা। মনে রাখতে হবে বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে প্রধানত সেই সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত যা পরবর্তী শিক্ষার ভিত্তি তৈরি করে দেয় এবং যা আবশ্যিকভাবে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরই পাঠ্য। দুটি বা তিনটি ভাষা, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, জীবনবিজ্ঞান, ভৌতবিজ্ঞান ইত্যাদির

কোনটিকে লঘু করা যাবে না। আবার নতুন নতুন বিষয়ের ভার শিক্ষার্থীদের উপর চাপিয়ে দিলে তাদের পক্ষে তা দুর্বিষহ বোঝা হয়ে দাঁড়াবে।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যা শিক্ষার সংস্থা পাঠক্রম, পাঠ পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা এখানে তুলে ধরা হল।

৫.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

- জনসংখ্যা শিক্ষার সংস্থাগুলি সম্বন্ধে ধারণা দিতে পারবেন।
- প্রথাগত প্রতিষ্ঠান ও প্রথাবহির্ভূত প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- জনসংখ্যা শিক্ষার পাঠক্রম সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পাঠক্রমের সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের সম্বন্ধ অনুধাবন করতে পারবেন।
- জনসংখ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর ভূমিকা অলোচনা করতে পারবেন।
- জনসংখ্যা শিক্ষার পাঠ পরিকল্পনা রচনা করতে পারবেন।

৫.৩ জনসংখ্যা শিক্ষার সংস্থা (Agencies of Population Education)

যে কোন সংগঠিত শিক্ষা ব্যবস্থা একক বা ব্যক্তিগতভাবে কার্যকর হতে পারে না। কোন প্রতিষ্ঠান যা শিক্ষাদানের বিশেষ উদ্দেশ্যে একসঙ্গে বহুব্যক্তির কাছে শিক্ষাকে পৌঁছে দিতে পারে তাকেই বলা হয় শিক্ষার সংস্থা। বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি শিক্ষার স্বীকৃত সংস্থা। কিন্তু বৃহত্তর অর্থে বিদ্যালয় জাতীয় প্রতিষ্ঠান ছাড়াও আরও নানা ধরনের সংস্থা থাকতে পারে। এমনকি কোন ধর্মীয় মঠ বা মিশন যদি বিশেষ কোন মতবাদ, বাণী বা মূল্যবোধ সম্বন্ধে জনসাধারণকে শিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে প্রচার চালায়, তাকেও এক ধরনের সংস্থা বলা যায়। এই সব কারণে, যে কোন শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রথাগত শিক্ষা (Formal Education) এবং প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা (Non formal Education) এই দুই প্রকার শিক্ষার আয়োজন দেখা যায়। স্বাভাবিক ভাবেই শিক্ষার সংস্থাগুলিও সেইভাবেই দুই ভাবে বিভক্ত।

৫.৩.১ প্রথাগত শিক্ষা (Formal Education)

এখানে প্রথমেই একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। শিক্ষা বিজ্ঞানে প্রথাগত ও প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা সম্বন্ধে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ আলোচিত হয়। এখানে আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে জনসংখ্যা শিক্ষার সংস্থা হিসাবে এই দুই প্রকার শিক্ষা ও প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা প্রসঙ্গে।

যখন কোন শিক্ষা ব্যবস্থা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত, পূর্ব-নির্ধারিত নিয়মে পরিচালিত হয় এবং নির্দিষ্ট পাঠক্রম অনুযায়ী যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষকের সক্রিয় শিক্ষণের মাধ্যমে অনেক শিক্ষার্থীকে একযোগে শিক্ষা দান করা হয়, তখন তাকে বলা হয় প্রথাগত শিক্ষা এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানকে বলা হয় প্রথাগত সংস্থা (Formal agency of education)। বলা বাহুল্য, প্রাথমিক, মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এই সবই প্রথাগত প্রতিষ্ঠান। তাদের শিক্ষা প্রথাগত শিক্ষা কারণ,

- নির্দিষ্ট সময়সীমায় এক একটি পাঠক্রম শেষ করতে হয়।
- পাঠক্রম শেষ করার পর একযোগে সকলের মূল্যায়ন করে পরবর্তী পাঠক্রমে অংশগ্রহণ করার অনুমোদন দেওয়া হয়।
- বিশেষ বিশেষ শিক্ষক এক সঙ্গে অনেক শিক্ষার্থীকে পাঠদান করেন।
- শিক্ষার্থীদের নিয়ম অনুযায়ী পাঠ গ্রহণ, শেষ করা এবং পরীক্ষা দিতে হয়।
- প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ব্যবস্থা নির্দিষ্ট আছে।
- আর্থিক ও বিদ্যাচর্চার জন্য স্বতন্ত্র পরিকল্পনা করা হয়।

এক কথায় সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থাটিই বাঁধা নিয়মে বছরের পর বছর তার লক্ষ্য পূরণের জন্য কাজ করে যায়।

জনসংখ্যা শিক্ষার জন্য কোন স্বতন্ত্র প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান থাকা সম্ভব নয়। সেজন্য যে সমস্ত প্রথাগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে তারাই জনসংখ্যা শিক্ষার প্রথাগত সংস্থা হিসাবে কাজ করতে পারে। জনসংখ্যা বিশারদ বা সকলেই সংস্থা হিসাবে বিদ্যালয়ের কথা বলেছেন। কারণ তারা মনে করেন বিদ্যালয় স্তর থেকেই জনসংখ্যা শিক্ষার প্রস্তুতি ও জনসংখ্যা সম্বন্ধে সচেতনতা তৈরি করা দরকার। কিন্তু বিদ্যালয়ের কোন স্তর থেকে শুরু করা যাবে সেই বিষয়টি বিচার করে দেখতে হবে।

প্রাথমিক স্তর (Primary Stage) : প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স 6 থেকে 11 বৎসর অর্থাৎ প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত। এই স্তরের পাঠক্রমে মাতৃভাষা, একটি বিদেশি ভাষা, পাটীগণিত, প্রকৃতি পরিচয় ইত্যাদি বিষয়গুলি পড়ানো হয়ে থাকে। মূল উদ্দেশ্য পরবর্তী শিক্ষার ভিত্তি হিসাবে যে দক্ষতাগুলি অর্জন করা দরকার তার প্রস্তুতি ও বিকাশ। আর সেই সঙ্গে তার চারপাশের পরিবেশ সম্বন্ধে জানা নিজের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা ইত্যাদি। জনসংখ্যা ও তার সমস্যা প্রাথমিক স্তরে অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মে চারপাশের জগৎ সম্বন্ধে শিশুদের কৌতুহল এবং সেই কৌতূহল চরিতার্থ করার মাধ্যমে ধীরে ধীরে প্রকৃতির সঙ্গে যে একাত্মতা বোধ গড়ে ওঠে তাকে পরবর্তীকালে পরিবেশ সচেতনতায় অনায়াসেই রূপান্তরিত করা যায়। গ্রামের শিশুদের সঙ্গে প্রাকৃতিক পরিবেশের যে নিবিড় পরিচয়, শহরের শিশুদের ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত। সেজন্য প্রত্যেকেরই উচিত শহরের বাইরে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে পরিচিতি ঘটানোর সুযোগ করে দেওয়া। যা পরবর্তী কালে জনসংখ্যা শিক্ষার ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে।

মাধ্যমিক স্তর (Secondary Stage) : মাধ্যমিক স্তরের উচ্চতর শ্রেণিতে এবং উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে জনসংখ্যা শিক্ষায় বিষয়টি শুরু করার সুবিধা সবচেয়ে বেশি। কৈশোরকালে মানুষের যুক্তিবোধ, উচ্চতর চিন্তার ক্ষমতা ক্রমশ পরিণত হতে থাকে। তাদের মধ্যে চারপাশের জগৎকে শুধুমাত্র আবেগের বশে নয়, যুক্তিবুদ্ধি ও

তথ্য দিয়ে বুঝে নেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। তাদের সংবেদনশীলতায় অনেক আপাত তুচ্ছ বিষয়কেও গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। সেজন্য জনসংখ্যা শিক্ষার ভিত্তি হিসাবে পারিবারিক জীবনের শিক্ষা শুরু করার এটাই প্রকৃষ্ট সময়।

তাছাড়াও কিশোর বয়সে দৈহিক পরিবর্তন, বিশেষত যৌন গ্রন্থিগুলির সক্রিয়তা ছেলেমেয়েদের যৌন সচেতন করে তোলে এবং তারা নানা বিভ্রান্তির শিকার হয়। এই পর্যায়ে পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে শিক্ষা তাদের সঠিক তথ্য দিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে পারে। পুরুষ ও নারীর সাম্য, পরস্পরের প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধাবোধ তা এই সময় সঠিকভাবে গড়ে তুলতে না পারলে সমাজে নারীর স্থান পুরুষের দৃষ্টিতে শুধুমাত্র ভোগের উপকরণ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। ভারতীয় সমাজে শুধু এই একটি কারণেই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সমস্যা আজও মেটেনি। এই কারণে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ই জনসংখ্যা শিক্ষার উৎকৃষ্টতম সংস্থা। মাধ্যমিক স্তরে বিষয়টির চর্চ্চা শুরু হলে পরবর্তী উচ্চতর পর্যায়ে তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব কিন্তু নতন করে শুরু করায় অনেক বাধা আছে।

৫.৩.২ প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা (Non formal Education)

জনসংখ্যা শিক্ষার প্রসারের জন্য প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা ও প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা খুব কম নয়। আমাদের দেশে এখনও সমস্ত বালক-বালিকা প্রথাগত শিক্ষার আওতায় আসেনি। স্কুল ছুটের সংখ্যা এখনও উদ্বেগজনক ভাবে বেশি এবং আদৌ স্কুলে ভর্তি না হওয়া ছেলেমেয়ের সংখ্যাও অনেক। সেজন্য শুধুমাত্র প্রথাগত শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করলে জনসংখ্যা শিক্ষাকে সর্বস্তরে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব নয়। আর জনসংখ্যা শিক্ষাকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে না পারলে তার উদ্দেশ্য কখনই সফল হবে না। সম্ভাব্য কয়েকটি প্রথা বহির্ভূত শিক্ষার প্রতিষ্ঠানের বিষয়টি এখানে তুলে ধরা হল।

মুক্ত বিদ্যালয় (Open School) : জাতীয় মুক্ত বিদ্যালয় (National Open School) অথবা রাজ্যস্তরে রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় জাতীয় প্রতিষ্ঠান, যাদের পাঠকেন্দ্র সারা দেশেই ছড়িয়ে আছে। তাদের মাধ্যমে জনসংখ্যা শিক্ষার প্রসার ঘটানো যেতে পারে। তবে ঐসব বিদ্যালয়কে সম্পূর্ণ প্রথা বহির্ভূত প্রতিষ্ঠান বলা যাবে কি না তা নিয়ে বিতর্ক উঠতে পারে। কারণ মুক্তবিদ্যালয়েও নির্দিষ্ট পাঠক্রমের ভিত্তিতে পড়া, পরীক্ষা দেওয়া, আমন্ত্রিত শিক্ষকের কাছে থেকে পরামর্শ নেওয়া এই সব বিষয়গুলি আছে। পাঠ শেষে একই পদ্ধতিতে পরীক্ষা দিতে হয় এবং পরবর্তী উচ্চতর শ্রেণিতে পড়ার ছাড়পত্র পাওয়া যায়।

পাঠকেন্দ্র কাছাকাছি না থাকলে, মুক্ত বিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয়বস্তু ডাক যোগে শিক্ষার্থীর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেদিক থেকে মুক্ত বিদ্যালয় ও দূরশিক্ষা (Distance Education) ব্যবস্থার মৌলিক পার্থক্য বিশেষ নেই।

বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র (Adult Education Centre) যারা আর কখনই বিদ্যালয়ে যাবে না, তাদের স্বাক্ষর করে তোলা ও কার্যকরী কিছু শিক্ষা দেওয়ার জন্য বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করা হয়। অন্যান্য বিষয় ছাড়াও জনসংখ্যা, তার নিয়ন্ত্রণ, কৃষি সমস্যা, সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ইত্যাদি নানা বিষয়ে গল্পচ্ছলে শিক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান হতে পারে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রগুলি। তার জন্য পরিকল্পনা, সহজভাষায় তথ্য সংকলন এবং তার আলোচনার পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রগুলিকে শুধুমাত্র স্বারক্ষরতা কেন্দ্র হিসাবে না রেখে প্রকৃত বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত করলে সেগুলি জনসংখ্যা শিক্ষায় ভালো সংস্থা হতে পারে।

জনশিক্ষা বিভাগ (Department of Mass Education) : প্রত্যেকটি রাজ্য সরকার এবং অনেক মিউনিসিপালিটিতে একটি করে জনশিক্ষা বিভাগ থাকে। এই বিভাগের কাজ প্রধানত স্বাস্থ্য, পানীয়, মহামারী (Epidemic), পুষ্টি, পরিবেশ ইত্যাদি নানা বিষয়ে জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলা। প্রধানতম পদ্ধতি প্রচার অর্থাৎ পোস্টার, স্লাইড শো সহকারে বক্তৃতার ব্যবস্থা ইত্যাদি। জনশিক্ষা দপ্তরের প্রচার পদ্ধতিকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করে সাধারণ মানুষের মধ্যে জনসংখ্যা, জীবনযাপনের মান, স্বাস্থ্য, পুষ্টি সংরক্ষণ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে সকলকে শিক্ষিত করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। জনশিক্ষা দপ্তর ও জনসংখ্যা শিক্ষার একটি উত্তম প্রথাবহির্ভূত সংস্থায় পরিণত হতে পারে।

গণমাধ্যম (Mass media) : সংবাদপত্র ও অন্যান্য মুদ্রিত মাধ্যম, রেডিও টেলিভিশন ইত্যাদি গণমাধ্যম গুলি জনসাধারণের মধ্যে অসীম প্রভাব বিস্তার করে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের সংবাদপত্র ও টেলিভিশনের অধিকাংশই বিনোদন, ছিদ্রান্বেষণ ও পরোক্ষ রাজনৈতিক প্রচার ছাড়া অন্য কোন ভূমিকা পালন করে না। সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন রেডিও ও টেলিভিশন কিছুটা দায়িত্ব পালনে সচেতন। কিন্তু জনসংখ্যা শিক্ষার সুপরিকল্পিত কোন ব্যবস্থা সেখানেও অনুপস্থিত। অথচ এইসব মাধ্যমের যথেষ্ট সুযোগ আছে বিনোদনের সঙ্গে জনসংখ্যা শিক্ষা ও পরিবেশ সচেতনতা তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়ার। সাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠানগুলি প্রায়ই সাধারণ মানুষের অনুপযোগী, অন্যান্য জনশিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রায় অনুপস্থিত। গণমাধ্যমগুলির এই বিষয়ে সচেতন হওয়া দরকার সর্বাগ্রে।

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (NGO) : নানা ধরনের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আমাদের দেশে সক্রিয়। কিন্তু তাদের মধ্যে অল্পসংখ্যক সংস্থাই জনসাধারণের মধ্যে জনসংখ্যা সংক্রান্ত শিক্ষা প্রসারের উদ্যোগ নিয়ে থাকে। এই সব সংস্থার প্রধানতম কাজ নানা সূত্র থেকে আর্থিক অনুদানে বলীয়ান হয়ে অধিকার রক্ষা, আইনের সাহায্যে সুযোগ সুবিধা আদায় করা, এবং সরকারের কাজকর্মের প্রহরী হিসাবে নজরদারি বজায় রাখা। অথচ এই সব প্রতিষ্ঠান সরাসরি জনসংখ্যা শিক্ষার মত প্রয়োজনীয় বিষয় প্রসারের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। এমনকি স্থানীয় স্তরে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিও ছোট ছোট সংগঠনের মাধ্যমে জনসংখ্যা শিক্ষার ভূমিকা সংস্থা হিসাবে সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে পারে। অবশ্যই তার জন্য একটি সমন্বয়কারী ও পরিকল্পনা রচনাকারী ব্যবস্থা থাকা দরকার।

৫.৪ জনসংখ্যা শিক্ষার পাঠক্রম (Curriculum of Population Education)

প্রথাগত শিক্ষার মধ্যেই জনসংখ্যা শিক্ষার প্রসার সবচেয়ে ভালোভাবে সম্পন্ন হতে পারে এ বিষয়ে সকলেই একমত। তার কারণগুলি ইতিমধ্যেই কিছু কিছু বলা হয়েছে। সংক্ষেপে কারণগুলি আর একবার তুলে ধরা দরকার।

- কিশোর বয়সে যুক্তিবুদ্ধি ও তথ্যের প্রতি আগ্রহ বাড়ে।
- তারা পরিবেশ সম্বন্ধে স্বাভাবিক ভাবেই সচেতন হতে থাকে।
- তাদের সৌন্দর্যচেতনা ও ন্যায়, অন্যায়, উচিত-অনুচিত বোধ এই সময় সবচেয়ে বাড়ে।
- ছেলে মেয়েদের পরস্পরের প্রতি স্থায়ী প্রতিন্যাস (attitude) গঠনের এটাই প্রকৃষ্ট সময়।
- যৌন চেতনার বিকাশকে পরিশীলিত পারিবারিক জীবনের ভিত্তি হিসাবে তৈরি করার এটাই সবচেয়ে ভালো সময়।

- যৌন জীবন সম্বন্ধে সঠিক তথ্য তাদের ভবিষ্যৎ বহু সমস্যার সম্ভাবনা গোড়াতেই দূর করতে পারবে।
- নিজেদের আচরণ সংযত করা, নিয়ন্ত্রণ করা এবং ভবিষ্যৎ বৃত্তি জীবনের জন্য তৈরি করার কাজ এখানেই শুরু হয়।

এই সব এবং আরও অনেক কারণে পারিবারিক জীবনযাপনের শিক্ষা ও জনসংখ্যা শিক্ষার একটি সংহত পাঠ প্রথাগত শিক্ষার মাধ্যমিক স্তর থেকে শুরু করাই বিধেয়। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে, এই শিক্ষার পাঠক্রম কি হবে?

প্রথমেই বলা হয়েছে যে জনসংখ্যা শিক্ষাকে একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে বিদ্যালয় পাঠক্রমে অন্তর্ভূক্ত করা সম্ভব নয়। আবার পূর্ববর্তী চারটি এককে জনসংখ্যা শিক্ষার উপাদানগুলি, তৎসহ কিছুটা বিষয়বস্তু সম্বন্ধে একটি ধারণা দেওয়া হয়েছে। এই উপাদান ও বয়সবস্তুকে কিভাবে বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের সঙ্গে যুক্ত করা হবে সেইটিই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। দুটি মূলনীতি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তার একটি সমন্বয়সাধন (Integration) এবং অপরটি পাঠক্রমের সহগামিতা (Correlation of curriculum)। প্রথম আলোচ্য বিষয় সমন্বয় সাধন।

৫.৪.১ পাঠক্রমের সমন্বয় (Integration of Curriculum)

সাধারণত বিদ্যচর্চার এক একটি ক্ষেত্রকে স্বতন্ত্র নাম দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় হিসাবে পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়। যেমন, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, সমাজবিদ্যা ইত্যাদি। এর সুবিধা যাই থাক অসুবিধার দিকটিও কম নয়। প্রথম সমস্যা, বিষয়বস্তুগুলির মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক শিক্ষার্থীদের কাছে সেই দিকটি অবহেলিত থেকে যায়। এক একটি বিষয় বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত। দ্বিতীয় সমস্যা, অনেক বিষয়ের মধ্যে শিক্ষার্থীর জন্য নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতাগুলি অভিন্ন হওয়ায়, একই বিষয় বারবার পড়তে বা শিখতে যেয়ে এক ঘেয়েমি, বিভ্রান্তি এবং শ্রমের অপচয় ঘটে।

কিন্তু যদি অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভিন্ন বিষয় থেকে নেওয়া শিক্ষণীয় বিষয়গুলি একত্রে শিক্ষা দেওয়া যায় এবং শেখা যায়, তবে উপরোক্ত সমস্যাগুলি দেখা যায় না। উপরন্তু শিখন আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় পাঠক্রমের সমন্বয় (Integration of Curriculum) এবং এর ফলে রচিত পাঠক্রমকে বলা হয় সমন্বিত পাঠক্রম (Integrated Curriculum)। উল্লেখযোগ্য এই যে, সমন্বিত পাঠক্রমের ধারণা নতুন কিছু নয়। John Dewey তার Laboratory School-এ সমন্বিত পাঠক্রমের সফল পরীক্ষা করেন।

জনসংখ্যা শিক্ষার উপাদানগুলিকে বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির সঙ্গে সমন্বয় সাধন করলে সবচেয়ে সহজে বিষয়টি শিক্ষা দেওয়া সম্ভব এর ফলে কয়েকটি বিশেষ সুবিধা পাওয়া যাবে।

- ছাত্রছাত্রীদের অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হবে না।
- শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুও জনসংখ্যা সম্পর্কিত তথ্য মিলিয়ে একটি সামগ্রিক ধারণা তারা গড়ে তুলতে পারবে।
- কোন স্বতন্ত্র মূল্যায়ন দরকার হবে না।
- শিক্ষকদের কাজ সহজ হবে। জনসংখ্যার উপাদানগুলি তাঁরা সহজেই ছাত্রছাত্রীদের সামনে তুলে ধরতে পারবেন।

সমন্বয় সাধনের দুটি আদর্শ প্রক্রিয়া আছে। প্রথম প্রক্রিয়াটির নাম **মিলিতকরণ (Infusion Model)** দ্বিতীয়টি **আন্তর্বিষয়ক সমন্বয় সাধন (Interdisupltinary Integration)**

মিলিতকরণ (Infusion Model) : এক্ষেত্রে জনসংখ্যা শিক্ষার উপাদানগুলি আলাদা ভাবে নির্বাচন করা হয়

না। যে পাঠক্রম ইতিমধ্যেই প্রচলিত আছে তার বিষয়বস্তু থেকে যে সমস্ত প্রসঙ্গগুলি জনসংখ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক সেই বিষয়গুলিকে চিহ্নিত করে তার মাধ্যমে জনশিক্ষার বিষয়টি যতটা সম্ভব তুলে ধরা হয়। যেমন, ভূগোল পাঠের সময়, জনসংখ্যার ঘনত্ব সম্বন্ধে পড়ানোর সময় জনসংখ্যার সমস্যা তুলে ধরা, কিংবা ইতিহাসে সভ্যতার উত্থান পতনে জনসংখ্যার ভূমিকার কথা আলোচনা করা ইত্যাদি। এই পদ্ধতিটি নিষ্ক্রিয় আদর্শ (Passive model)। এখানে জনসংখ্যা শিক্ষণ অনেকটা উপজাত ধারণা (Byproduct) হিসাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রায়ই দেখা যায় এর ফলে কাজের কাজ হয় না।

আন্তর্বিষয়ক সমন্বয় সাধন (Interdisciplinery Integration) : এইটি প্রকৃত সক্রিয় আদর্শ (Active model)। এই পদ্ধতিতে জনসংখ্যা শিক্ষার বাঞ্ছিত উপাদানগুলিকে প্রথমে নির্বাচন করা হয়। তারপর ঐ উপাদানগুলিকে বিভিন্ন বিষয়ের উপযুক্ত অংশে এমনভাবে সন্নিবেশিত করা হয় যে মূল বিষয়টির পাঠে কোন রকম বাধা সৃষ্টি না করেও জনসংখ্যা শিক্ষার প্রয়োজনীয় তথ্য শিক্ষার্থীদের জানা হয়ে যায়। যেমন, রসায়নের যে অংশে আকরিক থেকে লৌহ নিষ্কাশনের পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়, সেখানে লৌহ আকরিকের সঞ্চিত ভাণ্ডার সম্বন্ধে তথ্য দেওয়া যেতে পারে। অথবা কোন অঞ্চলের কৃষিজ উৎপাদনের বিষয়ের সঙ্গে ঐ অঞ্চলের জনসংখ্যার অনুপাতে কৃষিপণ্যের পরিমাণ সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া যেতে পারে।

পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার জন্য সমাজের বিবর্তন, বিশেষভাবে পশুদের সমাজ ও পারিবারিক জীবনের (যেমন, শিম্পাঞ্জি) সঙ্গে মানুষের পরিবারের সাদৃশ্য ও পার্থক্যগুলি উল্লেখ করা যায়। তবে এই পদ্ধতিতে মূল বিষয়বস্তুর পাঠক্রম সম্বন্ধেও নতুন করে চিন্তা-ভাবনা করা দরকার হয়। বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে জনশিক্ষার পাঠক্রমের সমন্বয় ও সম্পর্ক অনেকটা নিম্নরূপ।

এই ধরনের সমন্বয় করার সবচেয়ে বড় যুক্তি এই যে জনসংখ্যা শিক্ষা কোন স্বতন্ত্র একটি বিদ্যাচর্চার শাখা নয়। বিভিন্ন বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে উদ্ভূত জ্ঞান একত্রিত করে জনসংখ্যা শিক্ষা নামক বিষয়টি গড়ে উঠেছে। কোন বিষয়ের সঙ্গে জনসংখ্যা শিক্ষার কোন কোন উপাদানের সমন্বয় করা হবে তা নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট পাঠক্রম রচনার এবং জনসংখ্যার বিশেষজ্ঞদের উপর। কয়েকটি উদাহরণ ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে। আরও কয়েকটি উদাহরণ নিচে দেওয়া হল।

বিষয়	জনসংখ্যা শিক্ষার উপাদান	কোন অংশে দেওয়া হবে
ইতিহাস	সম্পদের আকর্ষণে মানুষের স্থানান্তর গমন	ভারতে বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও এখানে স্থায়ী ভাবে বসবাস
ভাষা ও সাহিত্য	অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও স্বাস্থ্যহীনতা	রচনা, পত্ররচনা, সাহিত্যের পাঠ্যবইতে দুই একটি নির্বাচিত প্রবন্ধ।
ভূগোল	আঞ্চলিক আবহাওয়ার পরিবর্তন	জলবায়ু সংক্রান্ত পাঠ
জীবন বিজ্ঞান	প্রজনন সংক্রান্ত প্রাথমিক তথ্য	প্রজনন ও বংশবিস্তার সম্বন্ধে পাঠ
ভৌতবিজ্ঞান	দূষণ সংক্রান্ত তথ্য জ্বালানি হিসাবে হাইড্রোজেন ব্যবহার	কার্বন ডাই অক্সাইডের প্রস্তুতি ও ধর্ম হাইড্রোজেনের প্রস্তুতি ও ধর্ম
সমাজবিদ্যা	মানবসমাজে পরিবার ও পারিবারিক সম্পর্কের ভূমিকা	একই বিষয়

৫.৪.২ পাঠক্রমের সহগমিতা (Correlation of Curriculum)

যখন অনেকগুলি সমান্তরল বিষয় পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয় কিন্তু তাদের একের সঙ্গে অপরের বিষয়বস্তুগত মিল কোন কোন অংশে স্বাভাবিকভাবে বিদ্যমান তখন শিক্ষকের দিক থেকে শিক্ষণের সময় ঐ সাদৃশ্যগুলিকে কাজে লাগিয়ে ধারণার ভিত্তিটি দৃঢ় করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় পাঠক্রমের সহগামিতা। যেমন, ভূগোলের অক্ষাংশ দ্রাঘিমার ধারণা, গণিতের গ্রাফ সম্বন্ধে ধারণার সাদৃশ্য, ভৌতবিজ্ঞানে বিদ্যুৎ শক্তির বিভব পার্থক্য ও জলের চাপ সংক্রান্ত তথ্যের সাদৃশ্য ইত্যাদি।

জনসংখ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে সহগামিতার প্রশ্নটি তখনই বিচার্য যখন এই বিষয়টিকে স্বতন্ত্র একটি পাঠ্য হিসাবে পাঠক্রমে স্থান দেওয়া হয়। কিন্তু প্রথমেই এই প্রসঙ্গটি বাতিল করা হয়েছে। সুতরাং জনসংখ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে সহগামিতার চেয়ে সমন্বয় সাধনের কার্যকারিতা অনেক বেশি।

৫.৫ সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী (Co-curricular Activities)

শিক্ষা বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের কাছে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর গুরুত্ব বিশেষ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। যে সমস্ত কার্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিক্ষার উদ্দেশ্য পূরণে সাহায্য করে কিন্তু সরাসরি পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাকে বলা হয় সহপাঠক্রমিক কাজ। সহপাঠক্রমিক কাজ,

- মূল বিষয়ের শিক্ষাকে সম্প্রসারিত করে।
- প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষাকে দৃঢ় করে।
- শিক্ষার জন্য উৎসাহ, উদ্দীপনা যোগায়।
- আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষালাভ করতে সাহায্য করে।
- পারস্পরিক বোঝাপড়া, দলগত কাজে উৎসাহ দেয়।
- সামগ্রিক বিকাশে সাহায্য করে।

জনসংখ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর গুরুত্ব অপরিসীম। এমন কি কখনও কখনও সহপাঠক্রমিক কাজই শিক্ষার প্রধান বাহন হয়ে উঠতে পারে। কয়েকটি সহপাঠক্রমিক কাজের উদাহরণ, যা জনসংখ্যা শিক্ষার সহায়ক উল্লেখ করা হল।

শিক্ষামূলক ভ্রমণ (Excursion) : দলবদ্ধভাবে শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে কোন বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান দেখতে যাওয়ার মধ্যে আনন্দ ও শিক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট সমন্বয় ঘটে। নদী, পবর্ত, ঐতিহাসিক স্থান, অরণ্য, ভৌগোলিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ কোন স্থানে শিক্ষামূলক ভ্রমণ হতে পারে। জনসংখ্যা শিক্ষার উপযোগী শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য স্থান নির্বাচন নির্ভর করে কোন কোন উপাদানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে তার উপর। যেমন, কোন অরণ্যে শিক্ষামূলক ভ্রমণ করতে যেয়ে শিক্ষার্থীরা অরণ্য ধ্বংসের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে পারবে।

প্রদর্শনী (Exhibition) : প্রায় প্রতিটি বিদ্যালয়েই বাৎসরিক কোন অনুষ্ঠানে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। জনসংখ্যা শিক্ষার বিষয়ে অতি উৎকৃষ্ট প্রদর্শনীর আয়োজন করা যেতে পারে। প্রদর্শনীতে শিক্ষার্থীদের উদ্যম, সংগঠনিক ক্ষমতা, পরিশ্রম ক্ষমতা ইত্যাদির পাশাপাশি শিল্প ও সৌন্দর্যবোধ, বিজ্ঞান চেতনা, উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ হয়। নিজেদের উদ্যোগেই অনেক কিছু শেখা হয়ে যায়। শুধু নিজের বিদ্যালয়েই নয়, আঞ্চলিক বা রাজ্য-স্তরের প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ, অন্যদের আয়োজিত প্রদর্শনীতে দেখতে যাওয়া এগুলিও শিক্ষার পক্ষে আদর্শন।

বিজ্ঞান সংগ্রহশালায় ভ্রমণ (Visit to Science Mus'þüum) : প্ল্যানেটারিয়াম, বিড়লা বিজ্ঞান ও কারিগরি সংগ্রহশালা, যাদুঘর প্রভৃতি সংগ্রহশালায় ভ্রমণের মাধ্যমে জনসংখ্যা শিক্ষার অনেক বিষয় জানা যায়।

সমাজসেবা (Social Service) : মাঝে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী কোন সমাজসেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করলে, তার ফল হয় সুদূর প্রসারী। গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিচ্ছন্নতা, পানীয় জলের বিশুদ্ধতা ইত্যাদি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ, প্রচার পদযাত্রা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করে শিক্ষার্থীরা যেমন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে

একাত্মতাবোধ করতে শিখবে তেমনি, এই জাতীয় কাজের মাধ্যমে জনসংখ্যা শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে সাহায্য করতে পারবে।

বিতর্ক, সাহিত্যপত্র প্রকাশ ও আলোচনা সভা (Debate, Magazine, Publication and Seminar) : মাঝে মাঝে বিতর্ক সভার আয়োজন করে নিজেদের যুক্তি ও বুদ্ধিকে শাণিত করা যায় এবং সেই সঙ্গে কোন একটি বিষয় সম্বন্ধে নানাদিক থেকে বিচার করার দক্ষতা অর্জন করা যায়। সাহিত্যপত্র, দেওয়াল পত্রিকা, প্রকাশ করে জনসংখ্যা শিক্ষার নানা তথ্য ও নিজেদের মতামত প্রকাশ করা যায়। আলোচনা আয়োজন করে বা আলোচনা সভায় যোগদান করে বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য শুনে জনসংখ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা ছাড়াও নানা প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে নিজেদের সংশয়গুলি দৃঢ় করে নেওয়া যায়।

কুইজ প্রতিযোগিতা (Quiz competition) : এই বিষয়টি বর্তমানে যথেষ্ট জনপ্রিয়। কুইজ প্রতিযোগিতার জন্য অসংখ্য তথ্য সংগ্রহ করতে হয় এবং যে কোন প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের জন্য নিজেকে তৈরি রাখতে হয়। বলা বাহুল্য জনসংখ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে কুইজের ভূমিকা অসামান্য।

৫.৬ পরিকল্পিত পাঠ (Planned Lesson)

শিক্ষণের উদ্দেশ্যে যে সংগঠিত পরিকল্পনা তৈরি করা হয়, অর্থাৎ শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের জন্য যে ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করা হয় তাকেই বলা হয় পাঠ পরিকল্পনা (Lesson Planning)। যে কোন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকই বিষয়টি জানেন এবং তার প্রয়োগ করে থাকেন, পূর্বাহ্নে পরিকল্পনা করে যে পাঠ দেওয়া হয় তাকেই বলা হয়েছে পরিকল্পিত পাঠ।

- পাঠ পরিকল্পনার প্রধান ধাপগুলি জানা থাকলে বিষয়টির গুরুত্ব বোঝা যাবে।
- পাঠ্যাংশ নির্বাচন, অর্থাৎ ক্লাসে কতটুকু অংশ পড়ানো হবে তার নির্বাচন।
- পাঠ্যাংশটির বিশ্লেষণ এবং ধারণা বা বিষয়বস্তুর প্রকৃতি অনুযায়ী ছোট ছোট স্বয়ংসম্পূর্ণ অংশে ভাগ করে নেওয়া।
- প্রতিটি ভাগের উদ্দেশ্য (Objective) স্থির করা এবং উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত আচরণগুলি স্থির করা।
- প্রতিটি ভাগের শিক্ষণ পদ্ধতি কি হবে তা স্থির করা
- কি ধরনের উদাহরণ (Example), প্রদর্শন (Demonstration) ইত্যাদি দরকার তা স্থির করা।
- শিক্ষণ সহায়ক উপকরণ (Teaching Aid) নির্বাচন।
- কি ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে পাঠপ্রক্রিয়া পরিচালনা করা হবে, এবং শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য কি ধরনের প্রশ্ন করা হবে তা স্থির করা।

পাঠের শেষে সারসংক্ষেপ লেখা এবং গৃহকৃত্য (Hom task) স্থির করা।

৫.৭.১. **সম্ভাব্য কয়েকটি শিক্ষণ পদ্ধতি (Some probable Teaching Methods) :** অধিকাংশ শিক্ষণ পদ্ধতিই জনসংখ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়।

- **বক্তৃতা (Lecture) :** শিক্ষক কর্তৃক একতরফা তথ্য প্রদান।
- **আবিষ্কারমূলক পদ্ধতি (Heiristic Method) :** প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পাঠ্য বিষয়ের ক্রমিক উন্মোচন।
- **পরীক্ষণ (Experimentation) :** শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
- **প্রোজেক্ট (Project) :** অন্যতম উৎকৃষ্ট পদ্ধতি। কোন বিষয়ে দলবদ্ধভাবে তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বাছাই, তথ্যের বিচার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, রিপোর্ট তৈরি করা এবং রিপোর্টের ভিত্তিতে পারস্পরিক আলোচনা।
- এছাড়াও সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমে উল্লিখিত কিছু কিছু পদ্ধতি।

৫.৭ সারসংক্ষেপ (Summary)

জনসংখ্যা শিক্ষার জন্য উপযুক্ত সংস্থা মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এর কারণ শিক্ষার্থীদের কৈশোরকালীন সমস্ত বৈশিষ্ট্যই এই স্তরে জনসংখ্যা শিক্ষাদানের অনুকূল। তাছাড়াও ভবিষ্যৎ পরিবারিক জীবন ও বৃত্তি জীবনের জন্যও এই স্তরে জনসংখ্যা শিক্ষা আবশ্যিক। বিদ্যালয় জনসংখ্যা শিক্ষার প্রথাগত সংস্থা হলেও অনেকগুলি প্রথা বহির্ভূত সংস্থারও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কারণ বিদ্যালয়ের বাইরেও বিপুল সংখ্যক জনগণ আছে যাদের জন্যও জন সংখ্যা শিক্ষা প্রয়োজন।

প্রথা বর্হিভূত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মুক্ত বিদ্যালয়, জনশিক্ষা বিভাগ, গণ মাধ্যম, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ইত্যাদি প্রধান। জনসংখ্যা শিক্ষার পাঠক্রম স্বতন্ত্রভাবে বিদ্যালয় পাঠক্রমের সঙ্গে যুক্ত করা সম্ভব নয়। সে জন্য অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে একত্রে পাঠদানের দুটি প্রক্রিয়া আছে। একটি হল সমন্বয় সাধন এবং অপরটি হল পাঠক্রমের সহগামিতা। সমন্বয় সাধনের দুটি পদ্ধতির প্রথমটির নাম মিলিতকরণ এই পদ্ধতিতে অন্যান্য বিষয়ের পাঠক্রমে যেখানে জনশিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন অংশ আছে সেখানে জনশিক্ষার প্রসঙ্গটি তুলে ধরা হয়। আর দ্বিতীয় পদ্ধতিটি সক্রিয় সমন্বয় সাধন, যেখানে প্রথমে জনসংখ্যা শিক্ষার প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি নির্বাচন করে অন্যান্য বিষয়ের পাঠক্রম রচনার সময় সেগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করা হয়। সহগামিতার অর্থ দুটি স্বতন্ত্র পাঠক্রমের মধ্যে সাদৃশ্যের জায়গাগুলি তুলে ধরা, যা জনসংখ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক।

জনসংখ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর ভূমিকা খুবই বেশি। শিক্ষামূলক ভ্রমণ, প্রদর্শনী, সমাজসেবায় অংশগ্রহণ, বিতর্ক, সাহিত্যপত্র প্রকাশ, কুইজ প্রতিযোগিতা ইত্যাদি সহপাঠক্রমিক কার্য

জনসংখ্যা শিক্ষার সহায়ক। শিক্ষণ পদ্ধতিগুলির মধ্যে আছে বক্তৃতা, আবিষ্কারমূলক পদ্ধতি, পরীক্ষণ, প্রোজেক্ট ইত্যাদি।

৫.৮ অনুশীলনী

1. অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Very Short Answers Questions)

(ক) প্রথাগত শিক্ষা কাকে বলে?

(খ) প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা কর?

(গ) জনসংখ্যা শিক্ষাকে মাধ্যমিক স্তরে স্থান দেওয়া যায় কেন? একটি কারণ লিখুন।

(ঘ) মুক্ত বিদ্যালয় কী?

(ঙ) জনসংখ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে টেলিভিশনের ভূমিকা কী হতে পারে?

(চ) মিলিত করণ কাকে বলে?

(ছ) আন্তর্বিষয়ক সমন্বয় সাধনকে সক্রিয় সমন্বয় বলা হয় কেন?

(জ) আন্তর্বিষয়ক সমন্বয়ের দুটি উদাহরণ দিন।

(ঝ) জনসংখ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিতর্ক সভার ভূমিকা কী?

(ঞ) আবিষ্কারমূলক পদ্ধতি কাকে বলে?

2. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Short Answers Questions)

(ক) সমন্বয় সাধনের দুটি পদ্ধতির তুলনা করুন।

(খ) সহগামিতা ও সমন্বয় সাধনের মধ্যে পার্থক্য উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

(গ) জনসংখ্যা শিক্ষায় বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রগুলিকে কিভাবে কাজে লাগানো যায়।

(ঘ) জনসংখ্যা শিক্ষা কেন মাধ্যমিক স্তরে শুরু করা উচিত ব্যাখ্যা করুন।

(ঙ) আন্তর্বিষয়ক সমন্বয় সাধন সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

(চ) জনসংখ্যা শিক্ষায় বিতর্ক, সাহিত্য পত্রিকা, আলোচনা সভা ইত্যাদির ভূমিকা কী?

(ছ) পরিকল্পিত পাঠ কী? পরিকল্পনার ধাপগুলি সংক্ষেপে লিখুন।

3. রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay Questions)

(ক) জনসংখ্যা শিক্ষার প্রথাগত পাঠক্রম সম্বন্ধে উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

(খ) জনসংখ্যা শিক্ষায় সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

(গ) জনসংখ্যা শিক্ষার পাঠক্রম ও শিক্ষণ পদ্ধতির পরিচয় দিন।

(ঘ) যে কোন বিষয় অবলম্বন করে জনসংখ্যা শিক্ষার একটি পাঠ পরিকল্পনা রচনা করুন।

৫.৯ গ্রন্থপঞ্জি

NCERT (1991), Population Education : A National Source Book. New Delhi.

Revunie, J. K. (1988) Population Resource and Development : A Guide Book, Gland, IUCN.

Bose, A. (1988), From Population to People-New Delhi. B. R. Publication.

Sharma, R. C. (1979) Population Education, Natun and Status, Bankok, UNESCO.

Sharma, R. C. (1984), Population Education, International Eneyclopedia of Population, Paris, UNESCO.

Choudhury, M. (1981) Population Dynamicy in India

বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরাজ কুমার ও ভট্টাচার্য, শিবপ্রসাদ (1993) (সম্পাদক) জনসংখ্যা শিক্ষা : জীবনের সার্বিক বিকাশের শিক্ষা, কলকাতা : রাজ্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গবেষণা পর্ষৎ।